পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহে পরিবেশসম্মত ভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

Ecologically based Rodent Management Training at CHTs Project

প্রশিক্ষক সহায়িকা

Trainer Manual

রচনায় : ড. সন্তোষ কুমার সরকার, ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল, মোহাম্মদ হারুন, মোঃ নাজমুল ইসলাম কাদরী, তপন কুমার বিশ্বাস, আবুল কালাম আজাদ, রোকেয়া বেগম শেফালী, মোশিয়ার রহমান, মোঃ আবু বাকের, কামরুল হাসান, মারুফ হোসেন, মোঃ সাইফুল হক, আব্দুল কাদের জিলানী, মোঃ বদরুজ্জদোজা বাপ্পি

প্রকাশনায় : এইড-কুমিল্লা

গ্রাম বাংলায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

Rat Management for Rural Communities Project

LEAD ORGANIZATION *AID-COMILLA*

Referance : ACIAR, Australia, Dr. Ken P.Aplin, Dr. Peter R. Brown, Dr. Jens Jacob, Dr. Charles J. Krebs & Dr. Grant R. Singleton

Krishi Katha Published by : Depertment of Agriculture Extension, Bangladesh

Rodent Research Team in Bangladesh : Dr. Steven R Belmain, NRI, University of Greenwich, UK, Dr. Nazira Q Kamal, Dr. Santosh Kumer Sarker,

প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ সূচি

রেজিষ্ট্রেশন (৯.০০-০৯.১৫) ঃ রেজিষ্ট্রেশন খাতায় স্বাক্ষর গ্রহণ উদ্বোধন ও পরিচিতি অনুষ্ঠান (০৯.১৫-১০.০০)

প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন

প্রশিক্ষণার্থী ও রিসোর্স পার্সন উভয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থান খোলামেলা হওয়া প্রয়োজন যেখানে প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন। গ্রামের যে দলের প্রশিক্ষণ হবে সেই স্থান অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীর প্রায় সমান বা অল্প দূরত্ব হয় এ রকম জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোন স্কুলে বা ঘরে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যাবে না। প্রশিক্ষণের স্থান উন্মুক্ত বড় গাছের নিচে হলে ভাল হয়। কোন বাড়ীতে যদি বড় গাছ থাকে, ভাল ছায়া বিদ্যমান ও ২৫ জন বসার উপযোগী হয় এরূপ স্থান প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী ও রিসোর্স পার্সনের জন্য একই রকম বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ স্থানে পলিথিন বিছানো যেতে পারে। গ্রাম বাংলায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ব্যানার প্রশিক্ষনার্থীদের মুখোমুখি পিছনে /পার্শে টানাতে হবে। হার্ডবোর্ড রিসোর্স পার্সনের বামপাশে রাখতে হবে। প্রশিক্ষনার্থীদের U আকারে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তার উপস্থিতি ঘটলে প্রশিক্ষনার্থীগণের নিকট কর্মসূচির গুরুত্ব, গ্রহণযোগ্যতা ও উৎসাহ অধিকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য, গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তবর্গ, শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের প্রধান দ্বারা উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এছাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তাগণকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসক ও উপ পরিচালক, ডিএইকে উপস্থিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রধানও উপস্থিত থাকবেন।

পরিচিতি অনুষ্ঠান

পরিবেশ বান্ধব ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রকৃত বাস্তবায়নকারী ও সহায়তাকারীদের (রিসোর্স পার্শোনেল) মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে ব্যক্তি পরিচিতি। কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ও কর্মীগণ কে সুন্দর, আন্তারিক, বন্ধুসুলভ প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নিজের পরিচয় দেয়ার অনুরোধ জানাবেন। প্রশিক্ষনার্থী ও প্রশিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব দূরকরার প্রয়াস চালাতে হবে।

প্রশিক্ষনার্থী ও প্রশিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব কমানো, বিভিন্ন বয়সের উচ্চ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর, ইঁদুর দমনে অভিজ্ঞ, অন অভিজ্ঞ, ধনী, গরীব বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশিক্ষণার্থী থাকবে। সবাইকে জ্ঞানের পরিমান এক পর্যায়ে নিতে হবে। এছাড়া শতকরা ৭০ ভাগ মহিলা দ্বারা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। কাজেই পরিচিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাই যেন বুঝতে পারে সবাইকে অংশ গ্রহণ ও সমান দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের ঘর বাড়ীর ও ফসলের মাঠের ইঁদুর ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে, কিন্তু প্রতিবেশি প্রত্যেকেই একই সময়ে একত্রে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশিক্ষকদের পোশাক ও আচরন

রিসোর্স পার্শোনের বা কর্মসূচী বাস্তাবয়ন কারীদের পোশাক হবে স্বাভাবিক ও সাধারণত কথা বলার ধরন ও উপস্থাপন সহজ ও বোধগম্য আঞ্চলিক ভাষায় করা প্রয়োজন। সাধু ভাষায় কথা না বলে চলতি ভাষায় বলা উত্তম। প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষা ও জিনিসের উচ্চারনের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে এ কথা মনে রাখতে হবে। আপনার আচরনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণভাব গড়ে তুলতে হবে।

দল গঠন (Group Formation)

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কাজের প্রতিযোগিতা জাগানোর জন্য দল গঠন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৫টি দলে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নিয়োগ করতে হবে। দল নেতা ও দল গঠন প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে করতে হবে। প্রত্যেক দলের নামকরণ করতে হবে। ইঁদুরের জাতের নাম অনুসারে করা যেতে পারে যেমন- মাঠের বড় কালো ইঁদুর, মাঠের কালো ইঁদুর, গেঁছো ইঁদুর ও সলই ইঁদুর।

প্রশিক্ষনার্থীগণের প্রত্যাশা (১০.০০-১০.১৫) প্রশিক্ষণে ২ ধরনের প্রত্যাশা বিদ্যমান। প্রথমত প্রশিক্ষকদের প্রত্যাশা ও দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রত্যাশা। দু দলের প্রত্যাশা পূরণ হলে কর্মসূচীর সফলতা বেশী আসবে। প্রশিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা জানা প্রয়োজন। আবার প্রত্যেক প্রশিক্ষাণার্থীদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে নানা রকম প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশিক্ষকদের প্রত্যাশা সুনির্দিষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট অগ্রগামী প্রশ্ন মালার (Leading questions) মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা জানতে হবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে তাদের নিকট হতে প্রত্যাশা জানা যেতে পারে। আবার দলগত ভাবে ও জানা যেতে পারে। প্রত্যেক দলের প্রত্যাশা পোষ্টার কাগজে রিসোর্স পার্সোনেল গণ লিখতে পারেন। পরবর্তীতে যেসব প্রত্যাশা একই রকম সেগুলো লিখে উপস্থাপন করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের সময় তাদের প্রত্যাশা পূরনের চেষ্টা করতে হবে।

অগ্রগামী প্রশ্ন

এখানে আমরা কেন সমবেত হয়েছি? আপনারা আমাদের নিকট হতে কি জানতে চান? ইঁদুর মারতে চাই? কেন মারতে চান? কোথায় ইঁদুরের সমস্যা? কিভাবে ইঁদুর মারতে চান? ইঁদুর কি সমস্যা সৃষ্টি করে? কোন সময় ইঁদুরের সমস্যা বেশি হয়? কি কি ভাবে ইঁদুর মারেন? আপনারা সবাই ইঁদুর মেরেছেন? না হলে কেন? হ্যাঁ হলে কেন? কাদের বাড়ীতে ইঁদুর উপদ্রব নেই? কেন ইঁদুর নেই? কাদের বাড়ীতে ইঁদুরের সমস্যা বেশি? কেন বেশি? সবাইর ইঁদুর মারা উচিৎ কিনা? হ্যাঁ হলে কেন? না হলে কেন? কে ইঁদুর মারেন?

অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী নগদ প্রাপ্তি খোঁজে। নিজের সমস্যার সমাধান পেতে চান। অনেকে হয়তো প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন ধারনা নাও থাকতে পারে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্য

প্রশিক্ষণ কি (What is traning)

প্রশিক্ষণ বলতে হাতে কলমে শিক্ষাকে বুঝায়। প্রযুক্তি হস্তান্তরের অন্যতম সহজ ও কার্যকরী পথ হচ্ছে প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ হচ্ছে নানা কর্মসূচীর ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে সম্ভাবনা ও সীমা বদ্ধতা দু'টোই থাকে। প্রশিক্ষণের শুরু বা শেষ বড় কথা নয়, এটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণার্থীগণ তার জ্ঞানের পরিধি কম বেশি বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সোনেল প্রশিক্ষণদান সংক্রান্ত তিনটি মৌলিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ পান। প্রথমত: যা তারা শেখাতে চান সেটি উপস্থাপন করতে পারেন; দ্বিতীয়ত: শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অনুশীলন করার জন্য প্রশিক্ষার্থীদেরকে সুযোগ দিতে পারেন এবং তৃতীয়ত: প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে শেখার জন্য তৈরী হয় এবং আগ্রহী হয়ে উঠে সেরকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ধারার পরিবর্তন ও সমস্যার সম্যাধানের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষনার্থীদের চাহিদা ভিত্তিক, সমস্যা ভিত্তিক এবং তাদের আশা আকাংখা পূরন করতে পারে। যে কোন প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ও উদ্দেশ্য ঠিক করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণের বিষয় স্তন্যপায়ী ক্ষতিকারক প্রাণী ইঁদুর ও তার ক্ষয়ক্ষতি রোধ ও ব্যবস্থাপনা।

ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী

১. পরিবেশ সম্মতভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা।
২. ইঁদুর ব্যবস্থাপনার লাগসই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো।
৩. ইঁদুরের পপুলেশনের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ব্যবস্থাপনা, ইঁদুর দ্বারা মাঠ ও গুদামজাত খাদ্যশস্য ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো।
৪. ইঁদুর - বাহিত রোগ জীবানুর বিস্তার রোধ ও পরিবেশের দূষণ কমানো।
৫. প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাধ্যমে অন্যদের ইঁদুর ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৬. সারা বছর একত্রে একই সময়ে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা চালু রাখা।

প্রশিক্ষণে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করার জন্য তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। যথা-

পরিবেশগত টেকসই (Ecological Sustainable)
সংস্কৃতিগত গ্রহণযোগ্যতা (Cultural accecptibility)
আর্থ সামাজিক স্থায়ীত্বতা (Socio-economic Sustainability)

প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মোদ্যোগের তত্ত্বের ভিত্তিতে আচরনগত মডেল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

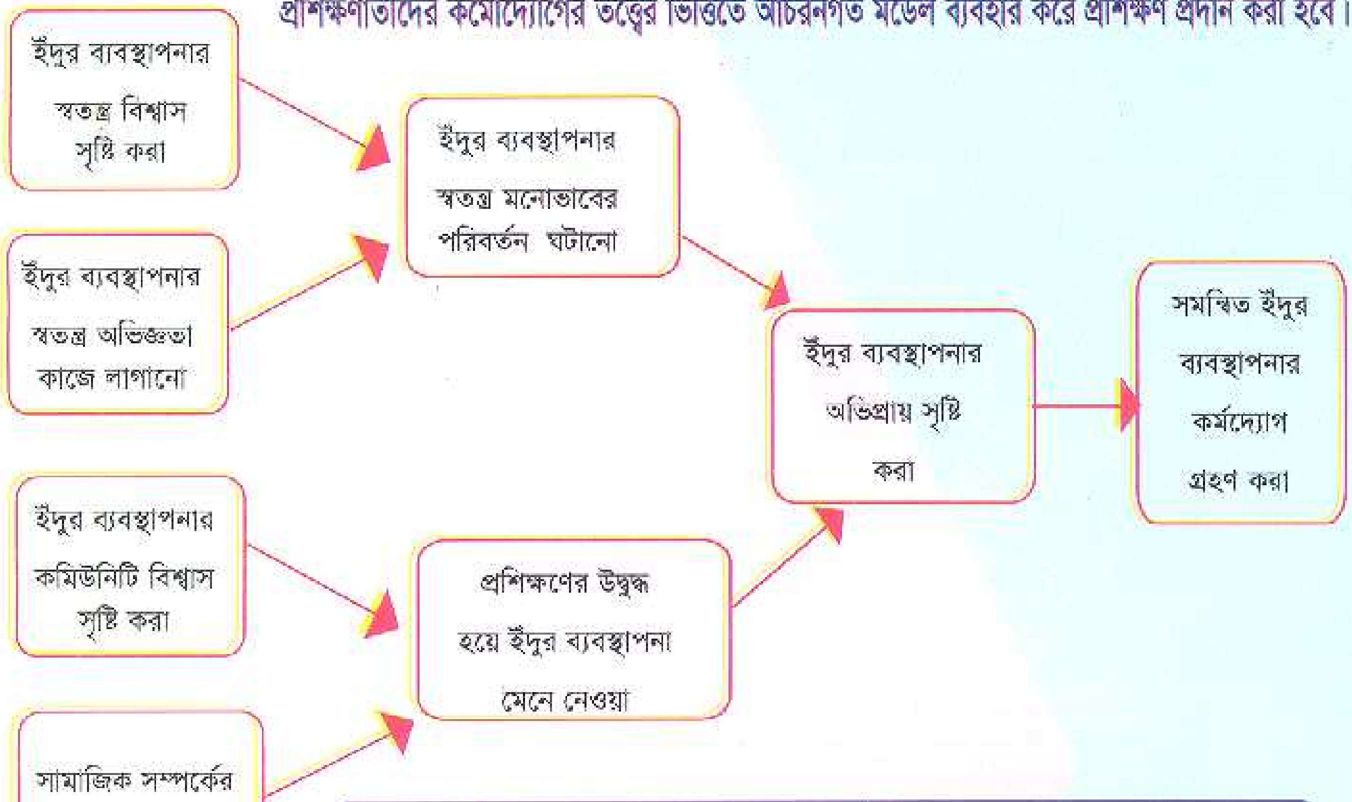

চিত্র : ইঁদুর ব্যবস্থাপনার কর্মোদ্যোগের তত্ত্বের ভিত্তিতে আচরনগত মডেলের প্রয়োগ।

ইঁদুর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিশ্বাস/গ্রহণযোগ্য মডেল অনুসরন করা

প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

১। প্রশিক্ষণার্থীদের সকলের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অনুসরন করা
২। ব্যবহারিক ক্লাশ তাত্ত্বিক ক্লাশের চেয়ে বেশি হবে।
৩। প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা ইঁদুর ধরার ফাঁদ ব্যবহার করানো।
৪। প্রশিক্ষণার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো।
৫। প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ইঁদুর সমস্যার আলোকের সমাধানের কৌশল প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৬। প্রত্যেকের বাড়ীর ইঁদুর প্রত্যেককেই মারতে হবে।
৭। পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত ইঁদুর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।

প্রশিক্ষণের জন্য নীতিমালা/ কিছু বক্তব্য

১। শিক্ষক নয়, রিসোর্স পার্শোনেল হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।
২। অধিবেশনের পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরন সংগ্রহ করে নিন।
৩। নিজে বেশি কথা না বলে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা বলতে দিন এবং সমস্যার আলোকে আলোচনা করতে হবে।
৪। প্রশিক্ষণার্থীদের এলাকা ভেদে নিজস্ব সমস্যার তাদেরকেই সমাধান করতে উৎসাহিত করুন।
৫। ভাল শ্রোতা হোন, অংশগ্রহণকারীদের উপর আপনার মতামত চাপিয়ে দিবেন না।
৬। কোন কিছুর উত্তর সরাসরি না দিয়ে জিজ্ঞেস করুন এ বিষয়ে তিনি কি মনে করেন।
৭। যতটা সম্ভব আঞ্চলিক ভাষায় সহজভাবে উপস্থাপন করুন।
৮। একটি গতিশীল ও উদ্যমী মনোভাবের সঞ্চার করে অধিবেশন শুরু ও শেষ করতে হবে।
৯। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে।

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নীতিমালা

১। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের ফাঁদ দ্বারা ইঁদুর ধরতে হবে এবং ইঁদুরের প্রজন্ম সনাক্ত করতে হবে।
২। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে।
৩। ইঁদুর মারার বিষ টোপের সহিত পরিচয় ঘটানো ও ব্যবহার করানো।
৪। দলগতভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে নিশ্চিয়তা দান।

ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর আচরণ ও জীবন বৃত্তান্ত (Rodent behavior and Biology)

ইঁদুর জাতীয় প্রাণী কাকে বলে?

ইংরেজী শব্দ Rodent এর জন্য বাংলায় সহজ প্রতিশব্দ না থাকায় এর প্রতি শব্দ হিসেবে "ইঁদুর জাতীয় প্রাণী" ব্যবহার করা হয়। এ প্রাণীসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের দাঁতের গঠন ও তার বিন্যাস। এদের উভয় পাটিতে সামনে এক জোড়া করে ছেদন দাঁত (Incisor) থাকে যা অত্যান্ত তীক্ষ্ণ ও ধারালো বাটালীর মত। এ ছেদন দাঁত জন্মের পর হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাড়তে থাকে। তাই দাঁত ঠিক রাখার জন্য অনবরত কাটাকাটি করে এবং গর্ত খোড়ে। ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, সজারু হচ্ছে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী।

ইঁদুরজাতীয় প্রাণির দাঁতের ফরমূলা হচ্ছে :

দাঁতের সংখ্যা = ১০০৩ / ১০০৩ ২ = ১৬ টি

= ছেদন দাঁত (Incisor) = ৪টি

০ = মাংশাসী দাঁত (Canine) = ০টি

০= প্রেষণ পূর্ব দাঁত (Premolar) = ০টি

৩ = প্রেষণ দাঁত (Molar) = ১২ টি

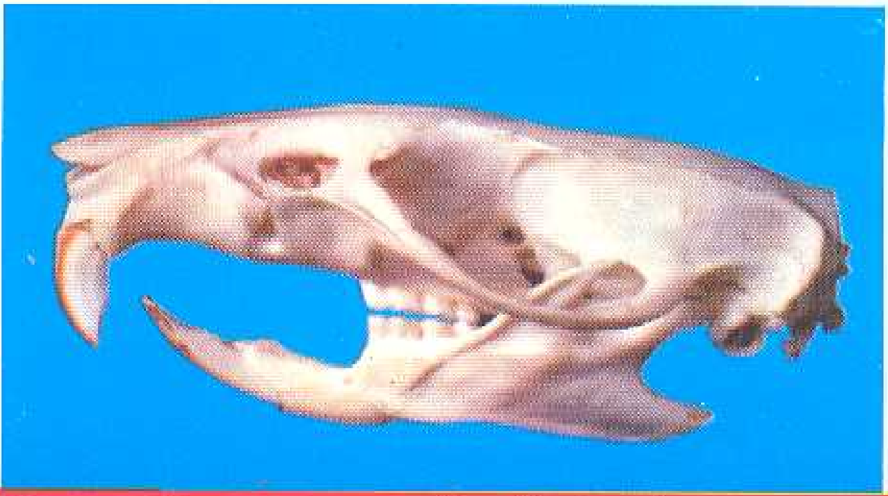

রোডেন্ট ঃ শ্রেণী বিন্যাস

শ্রেণী বিন্যাসে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী রোডেনসিয়া বর্গের অন্তর্ভূক্ত। সারা পৃথিবীতে ২৭০০টির অধিক ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর প্রজাতি আছে। বাস্তবে পৃথিবীর সকল স্তন্য পায়ী প্রজাতির মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। এদের দুই-তৃতীয়াংশ জীবিত রোডেন্ট প্রজাতি মিউরিডি (Muridae) পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। রোডেনসিয়া বর্গের অন্তর্গত আবার অনেকগুলো পরিবার (Family) আছে। বাংলাদেশে ৪টি পরিবারের অন্তর্গত প্রাণী সমূহই কৃষি ক্ষেত্রে প্রধান ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে। যথা-

১। **পরিবার হিস্ট্রিসিডি (Family Hystricidae)**

দেহ মোটা আকারের বেশ লম্বা, শক্ত ও ধারালো কাঁটা অভিক্ষেপ লোম জুরে আছে উদাহরণ- শজারু (Porcupines)

২। **পরিবার রাইজোমাইডি (Family Rhizomyidae)**

মোটা আকারের লেজ খাঁটো আঁশবিহীন এবং প্রায় লোমহীন হয়। উদাহরণ- বাঁশের ইঁদুর (Bamboo rat)

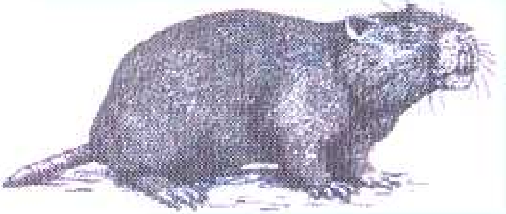

৩। **পরিবার স্কাইইউরিডি (Family Sciaridae)**

বাদামী কাঠ বিড়ালি ও ডোরাকাটা কাঠবিড়ালী লেজের গোড়া হতে আগা পর্যন্ত ভারী পশমযুক্ত হয়।

৪। **পরিবার মিউরিডি (Family Muridae)**

অধিকাংশের দেহ সরু, লেজ সাধারণত অল্প পরিমাপে বিক্ষিপ্ত লোম এবং স্পষ্ট আঁশ সমূহ এক কেন্দ্র বিশিষ্ট রিংগুলো সাজানো থাকে। উদাহরণ ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর ইত্যাদি। মিউরিডি গোত্রে ১৩৫০ টির অধিক প্রজাতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র ২০টি নানা ধরনের ইঁদুরের প্রজাতি এবং সম সংখ্যক আরও কয়েকটি প্রজাতি ক্ষতিকারক পেষ্ট বা বালাই রূপে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১২টি ইঁদুর জাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে।

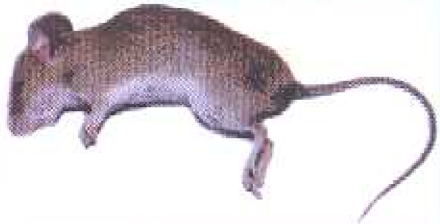

ইঁদুরের আচরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী

১। যে কোন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে।
২। যে কোন খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। (সর্বভূক প্রাণী)
৩। অল্প বয়সে বাচ্চা প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে;
৪। খাদ্য, পানি ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পেলে বাচ্চার সংখ্যা বাড়ানো অথবা কমানোর ক্ষমতা রয়েছে;
৫। গর্ভ ধারণ কাল স্বল্প (১৮-২২দিন), বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পুনরায় গর্ভধারন করতে পারে।
৬। সার্বক্ষনিক কৌতূহলী (Inquistive) এবং অনুসন্ধানকারী (Exploratory) স্বভাব
৭। খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে থাকে।
৮। ইঁদুর সন্ধ্যা ও ভোর রাত্রে খাদ্য গ্রহণ ও সংগ্রহ করে।
৯। ইঁদুরের খাদ্যভ্যাস প্রজাতি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি একই গোত্রের বা দলের প্রতিটি ইঁদুরের খাদ্যভ্যাস এক রকম নহে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষতিকর ইঁদুর প্রজাতির তালিকা

নাম	আক্রমনের তীব্রতা	কোথায় ক্ষতি করে	কোথায় থাকে
১। মাঠের কালো ইঁদুর (*Bandicota bengalensis*)	XXX	সব মাঠ ফসল, গুদামের খাদ্যশস্য, রাস্তা ঘাটের	মাঠে, ঘরবাড়ীতে, রাস্তাঘাটে সর্বত্র গর্তে থাকে
২। মাঠের বড় কালো ইঁদুর (*Bandicota indica*)	X	নীচু এলাকার ধান ও অন্যান্য ফসলের	মাঠের পকুরের পারে, হাওড় ও বিল এলাকার গর্তে থাকে
৩। ঘরের ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর (*Rattus rattus*)	XXX	গুদাম ঘর/বাসাবাড়ী নারিকেল সহ অন্যান্য ফলের	ঘর বাড়ী, বাগান, সব ধরনের গাছে
৪। বাদামী ইঁদুর বা নরওয়ে ইঁদুর (*Rattus norvegicus*)	X	খাদ্য গুদামে	বন্দর ও শহর এলাকা
৫। নরম পশম যুক্ত ইঁদুর (*Millardia meltada*)	X	ধান, গম ও অন্যান্য ফসলে	ফসলের মাঠে (গর্তে থাকে)
৬। প্যাসিফিক ইঁদুর (*Rattas exulans*)	X	খাদ্য গুদামে, ঘরবাড়ী	ঘর বাড়ী (গর্তে)
৭। ছোট লেজ যুক্ত মোল ইঁদুর (*Nesokia indica*)	XX	আখের ক্ষেত ও অন্যান্য ফসলে	পশ্চিমাঞ্চলে (রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ইশ্বরদী গর্তে থাকে)
৮। বাত্তি বা নেংটি ইঁদুর (*Mus musculus*)	XX	খাদ্য গুদাম, ঘরবাড়ী	ঘর বাড়ীতে (সিলিং ও অন্যান্য স্থানে)
৯। মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর (*Mus terricolor*)	XX	সজি বাগান, ধান ফসলে	বাড়ীর আশে পাশে ধান ক্ষেতে গর্তে বাস করে
১০। মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর (*Mus booduga*)	X	সজি ও ধান ফসলের	ঘর বাড়ীতে ও জমির আইলে ফসলের মাঠে গর্তে থাকে
১১। বাঁশের ইঁদুর (*Cannomys badius*)	XXX	বাঁশের কান্ডের ক্ষতি করে	মাটির নীচে গর্তে বাস করে
১২। সাদা লোমযুক্ত ইঁদুর (সনাক্ত করা হয় নাই)	XXX	বান্দরবান এলাকায় ঝুম ফসলের ক্ষতি করে।	সম্ভবত গাছে থাকে (গবেষনা হয় নাই)

XXX = খুব বেশি ক্ষতি করে

XX = মোটামোটি ক্ষতি করে

X = কম ক্ষতি করে

মাঠের কালো ইঁদুর (*Bandicota bengalensis*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি (General characteristics)

মধ্যম আকারের মোটাসোটা ধরনের ইঁদুর। পার্থক্যসূচক ভোতা সামান্য উর্ধ্বমূখী নাক আছে। শরীরের উপরের অংশ কালচে ধূসর ও পেটের অংশ হালকা ধূসর রং বিশিষ্ট। লেজ সাধারণত ২০-৩০ মি.মি. লম্বা হয়। লেজের রং কালো। মাথা ও শরীরের তুলনায় ৮০% লেজ ছোট হয়।

বিস্তৃতি (Distribution)

সমগ্র উপমহাদেশ, বার্মা, সুমাত্রা ও জাভা পর্যন্ত এ প্রজাতি ইঁদুর দেখা যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই এদের বিস্তৃতি রয়েছে।

নিবাস ও আচরন (Habital and behavior) : মাঠের কালো ইঁদুর, সাধারণত গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে এবং শস্য এলাকাতে (মাঠে) দেখা যায়। সাধারণত বেশি বৃষ্টিপাত প্রবন এলাকায় বেশি দেখা যায়। গ্রাম ও শহরের গুদামে দেখা যায়। গাছ, ছাদ বা অন্য কোন উঁচু স্থানে উঠতে পারে না। ভাল সাঁতার জানে গভীর পানির ধান শস্যের ক্ষতি করে। অধিকাংশ নিবাসে তারা সুনির্দিষ্ট গর্ত পদ্ধতি (Burrow System) নির্মান করে। মাঠের বাঁধ, শাকসব্জী বাগান, ফসলের বাগান এবং দালান কোঠা বা ঘরের মেঝে ও দেওয়াল সমূহে গর্ত করে। অধিকাংশ গর্তের প্রবেশ পথ দিনে বন্ধ রাখে। গর্তে বহুবিধ কক্ষ এবং প্রবেশ পথ (প্রায় ১২-১৬টি প্রতি গর্তে) থাকে। গর্তে সাধারণত একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ অথবা স্ত্রী অথবা স্ত্রী তাদের বাচ্চা সহ বাস করে। একটি গর্ত খুড়ে গড়ে ৫-১০ কেজি সংরক্ষণকৃত ধান/গম পাওয়া গেছে। এরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য মজুত করে। ভোর ও সন্ধ্যা বেলায় এরা অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। বাংলাদেশে প্রতি হেক্টরে ২০-২৫টি সক্রিয় গর্ত পাওয়া গেছে।

জীবনবৃত্তান্ত (Biology) :

গ্রামের ইঁদুর পপুলেশনের প্রজনন তৎপরতা মৌসুম ভিত্তিক এবং শস্যের পরিপক্কতার সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। ইস্ট্রাস চক্র ৩-৫ দিন এবং গর্ভধারণ কাল ২১-২৫ দিন হয়। জন্মের সময় লোম বিহীন, অন্ধ বাচ্চার ওজন ৩.৫-৫.০ গ্রাম হয়। চোখ খোলে ১৪-১৮ দিনে। প্রায় ৭-৯ দিনে ছেদন দাঁত উঠা শুরু করে। স্তন পান ছেড়ে দেয় প্রায় ২৫-২৮ দিনে। যৌন সক্রিয়তা যতটা সম্ভব ৩ মাস বয়সে স্ত্রী এবং সামান্য পরে পুরুষের আসে। গ্রামে মৌসুম ভেদে গড় বাচ্চার সংখ্যা ৬.৭ হতে ১০.২টি। জীবনকাল গুদামে প্রায় ২০০ দিন এবং সাধারণত এক বছরের বেশি বেঁচে থাকে। প্রতিটি স্ত্রী গড়ে ৪৩.৬টি বাচ্চা প্রতি বছর প্রদান করে থাকে। ধান, গম ফসলে থোর হতে পাকা অবস্থায় এদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

মাঠের কালো ইঁদুর (*Bandicota bengalensis*)

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status)

এ প্রজাতির ইঁদুর মাঠের সকল প্রকার শস্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। বীজতলা ও ফসলের চারা অবস্থা হতে পাকা পর্যন্ত সকল স্তরে ব্যাপক ক্ষতি করে। একটি ইঁদুর এক রাত্রে ২০০-৩০০টি কুশি কাটতে পারে। মাঠ ফসলের মোট উৎপাদনের প্রায় ১০-১৫ ভাগের সমান। ভারতের পশ্চিম বাংলায় আদ্র মৌসুমে ধান শস্যের ভক্ষণকৃত এবং মজুতের মধ্য প্রদেশের গম উৎপাদন এলাকার ফসলের ক্ষতির পরিমান প্রতি হেক্টরে ২৬১-৩৮৮ কেজি পর্যন্ত পেয়েছে। বাংলাদেশে গম ফসলে ২০% উর্ধে এ প্রজাতির দ্বারা ক্ষতি হয়। এছাড়া রাস্তাঘাট, পানি সেচের নালা, বাঁধ এবং ঘরবাড়ীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিমানে ক্ষতি করে থাকে। এজন্য বাংলাদেশের মাঠ ফসল ও গুদাম এবং সম্পদের এক নম্বর ক্ষতিকারক প্রজাতী হলো মাঠের কালো ইঁদুর।

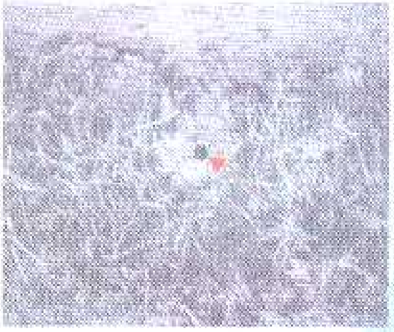

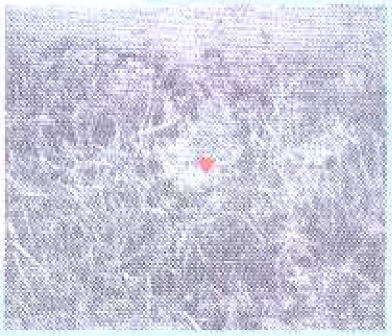

মাঠের বড় কালো ইঁদুর (*Bandicota indica*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characteristics)

দেখতে মাঠের কালো ইঁদুরের ন্যায়। কিন্তু তাদের চেয়ে আকারে অনেক বড়। পূর্ণ বয়স্কদের ওজন প্রায় ৫০০-১০০০ গ্রাম হয়। পিছনের দিকটা প্রায় বেশ বড় এবং কালো হয়। পিছনের পা ৪৪ মি.মি. এর বেশি লম্বা হয়। পৃষ্ঠ দেশের লোম ঝাঁকড়া এবং পিছনে ও পাঁজরে কালচে-বাদামী হয়। পেটের লোম সাধারণত কালো ধূসর হয়। লেজ লম্বায় মাথা+ দেহের চেয়ে খাটো হয়। লেজ সমভাবে কালো হয়। শক্তিশালী নখর আছে যা গর্ত খননের কাজে ব্যবহার করে। এরা ভাল সাঁতার কাটতে পারে।

বিস্তৃতি (Distribution)

বাংলাদেশের সব নীচু এলাকায় পাওয়া যায়। শুকনো মৌসুমে যে সমস্ত জায়গায় মাটিতে পানির ভাগ বেশি থাকে অর্থাৎ হাওর বিল ও মাঠের পুকুরের পাড়ে বেশি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে দালান কোঠা বা ঘরবাড়ীতে দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন দেশে মাঠ ও গ্রামে পাওয়া যায়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র মাঠের বড় কালো ইঁদুরের উপস্থিতি আছে।

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior) :

পতিত জলাভুমি, পুকুর অথবা নদীর পাড়ে পাওয়া যায়। এরা গর্তে বাস করে। গর্তের পরিসর খাটো সুড়ঙ্গ (৭২ সে.মি.) হতে সুনির্মিত এবং বিশাল জটিল বহু কক্ষ এবং প্রবেশ পথ (বৃহত্তর ৩০০ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে) যা খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করে। গর্ত পদ্ধতি সাধারণত খোলা রাখে এবং অনেক সময় পাইলের মতো স্তুপাকার মল অথবা খাদ্যের আবর্জনা স্তুপ করে রাখে। বড় বর্গ কমপ্লেক্সে অসংখ্য পূর্ণবয়স্করা তাদের বাচ্চাদের সহ অবস্থান করে। রাত্রি কালীন গতিবিধি প্রায় ২৫০ মিটার দূর হতে খাদ্য সংগ্রহ করে গর্তে ফিরে আসে। ভারতে প্রতি হেক্টরে গড়ে ৩৮টি সক্রিয় গর্ত পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশে ২০-২৫টি গর্ত প্রতি হেক্টরে পাওয়া গেছে।

জীবন বৃত্তান্ত (Biology) :

অক্টোবর হতে এপ্রিল মাস এ প্রজাতির ইঁদুরের প্রজনন বেশি হয়। ইস্ট্রাস (Oestrus) চক্র সাধারণত ৪-৮ দিন। গর্ভ ধারণ কাল ২৩ দিন। প্রতি বারে ১-৮ টি বাচ্চা দেয় (গড়ে ৫টি)। জন্মের ১৯০-২১০ দিন পরে যৌন ছিদ্রিত ঘটে যখন দেহের ওজন ২৮৭-৩৪৫ গ্রাম হয়। কুমিল্লার পপুলেশনে যৌন অছিদ্রিত স্বতন্ত্রের দেহের ওজন ১৯০-৩০০ গ্রামের মধ্যে পাওয়া গেছে। মাঠে ১-২ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। চোখ খোলে ১৮-২০ দিন পর। বাচ্চা মাকে ছেড়ে যায় ২৮ দিন পর।

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status) :

যেখানে অবস্থান করে সেখানকার ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। অদ্র বীজতলা, ভাসা আমনধানের বেশি ক্ষতি করে। সাঁতার জানে বলে ভাসা আমন ধানের জমিতে বাসা বেধে ক্ষতি করতে পারে। এরা দ্বীপের বনজ উদ্ভিদের বেশ ক্ষতি সাধন করে। এরা শামুক জাতীয় শক্ত ও কোমল দেহ বিশিষ্ট প্রাণী ও কাঁকড়া শিকার করে খেয়ে থাকে। এজন্য এ সমস্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী দ্বারা ধান সহ অন্য ফসলের ক্ষতি কম হয়। এরা প্রতি দিন কোমলাঙ্গ প্রাণীর মাংস ৯৫ গ্রাম অথবা ৩৫ গ্রাম ধান খেয়ে থাকে। ধান শস্যের প্রতি রাত্রে ১-৪ বর্গ মিটারের কুশি কেটে

মাঠের বড় কালো ইঁদুর (*Bandicota indica*)

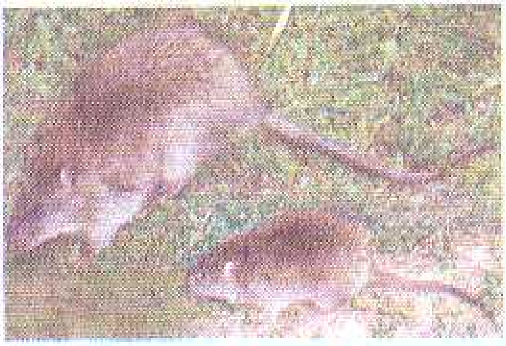

মাঠের বড় কালো ইঁদুর (*Bandicota indica*)

ঘরের ইঁদুর/ গেছো ইঁদুর (*Rattus rattus*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যবলী (General characteristics)

মাঝারী আকারের ইঁদুর। ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম। দেহ ও মাথার চেয়ে লেজ অনেক বড়। পিছনের পায়ের ও পরের বহির্ভাগ প্রায় বিশুদ্ধ সাদা হয়। পায়ের আঙ্গুলের লোম সাদা হয়। পৃষ্ঠ দেশের লোম সাধারণত বাদামী ছায়া হয়। (ঈষৎ ধূসর হতে লালচে)। বুকের রং সাধারণত সাদা বা হালকা রং এর হয়। নাক মাঝারী ধরনের লম্বা এবং সরু হয়। কান বড় এবং পাতলা পশমযুক্ত।

বিস্তৃতি (Distribution)

সাধারণত শহর ও গ্রামের ঘরবাড়ীতে বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার মূল ভূমির সকল বড় ছোট দ্বীপ সমূহের সর্বত্র পাওয়া যায়। সেন্টমার্টিন দ্বীপেও এদের সংখ্যাই বেশি রয়েছে।

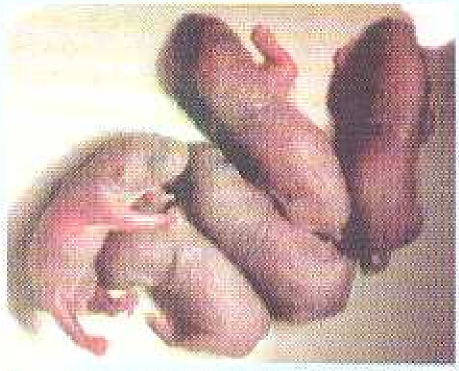

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior)

সাধারণত নিশাচর। ঘরের সিলিং এবং নারিকেল সহ অন্যান্য ফলের গাছে বাস করে। খাদ্য গুদামে ও সিলিং এদের বেশি দেখা যায়। এরা গর্তে থাকে না। সাধারণত বাংলাদেশে মাঠে এদের দেখা যায় না। গ্রামের আবাস ভূমির অব্যবহিত দূরে গাছের ঝাড়ে এবং উঁচু ভূমিতে পাওয়া যায়। এরা এক গাছ হতে অন্য গাছে সহজেই যেতে পারে। একত্রে অনেকগুলো ইঁদুর বাস করে।

জীবন বৃত্তান্ত (Biology) :

সারা বছর ধরে বংশ বিস্তার করে থাকে। গর্ভধারনকাল ২০-২২ দিন। লোমহীন, অন্ধ ৩-৬.৪ গ্রাম ওজনের বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চার সংখ্যা ৬-১৪টি। জন্মের ৭-১২ দিন পরে ছেদন দাঁত খোলে জন্মের ১১-১৫ দিন পরে কানের নালা খোলে ১০-১৪ দিনে। মাকে ছেড়ে যায় ২৩-২৮ দিন পরে। অধিকাংশ প্রথম গর্ভধারন ৮০-১০০ গ্রামের ওপরে সাধারণত হয়। সাধারণত জীবন কাল ১-২ বছর।

ঘরের ইঁদুর বা গেছো ইঁদুর (*Rattus rattus*)

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status) :

বাংলাদেশে মাঠের কালো ইঁদুরের ক্ষতির তীব্রতার পরেই এ প্রজাতির স্থান অর্থাৎ ক্ষতিকর ভূমিকার বিবেচনায় এদের স্থান দ্বিতীয়। ঘরবাড়ী ও গুদামের খাদ্য শস্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। আনারস, নারিকেল ও সবজীর ব্যাপক ক্ষতি করে। ভাল গাছ বাইতে পারে বলে সাধাণত সকল প্রকার ফলমূলের প্রচুর ক্ষতি করতে পারে।

বাত্তি/সলই/নেংটি ইঁদুর (*Mus musculus*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী (General characteristics)

ছোট আকারের ইঁদুর (ওজন ১৫-২৬ গ্রাম) এ প্রজাতির ইঁদুর ধূসর অথবা বাদামী রং এর হয়। সলই ইঁদুরের লেজ মাথা ও দেহের চেয়ে লম্বা হয় (১২০%)। পিছনের এবং পাজরের পশম নরম। লেজের উপরিভাগ ও নীচের ভাগের রং একই রকম। পিছনের পায়ের সকল প্ল্যান্টার প্যাড ছোট হয়।

বিস্তৃতি (Distribution) : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে সর্বত্রই এদের ঘরবাড়ীতে ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ দলের ইঁদুর সাধারণত মানুষের আবাস ভূমির চারপাশে দেখা যায়।

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior) :

বাংলাদেশে এ প্রজাতির ইঁদুর ঘরে এবং অন্যান্য আশ্রয় স্থান ব্যবহার করে থাকে। যেমন- দালানের গর্ত, খননকৃত দেওয়াল, বাক্স, মেঝে অথবা খড়ের স্তুপ, শীতাতপ যন্ত্র, পাইপের ছিদ্র ইত্যাদি। গুদামে কাপড় অথবা কাগজ ও অন্যান্য জিনিস দ্বারা বাসা করে থাকে। গ্রামে ও শহরে খরের দেওয়ালে, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে, এবং ছাদ এলাকা দিয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এ প্রজাতির ইঁদুর গর্ত করতে পারে না। একত্রে অনেকগুলো বাস করে। অল্প পানি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এদের গতি বিধি বাসস্থান প্রায় ১০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। আরোহনে অত্যান্ত পটু এবং $\frac{1}{4}''$ ছিদ্র দিয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে।

জীবন বৃত্তান্ত (Biology) :

গর্ভধারণকাল ১৮-২১ দিন। অন্ধ, লোমবিহীন, বন্ধকান বিশিষ্ট ১.২ গ্রাম ওজনের বাচ্চা প্রসব করে। এক সাথে ৪-৬টা বাচ্চা দেয়। বাচ্চা প্রদানের মধ্যে গড় বিরতি ৫০ দিন হয়। কানের পিনা খোলে ও পশম উঠে ২-৩ দিন পর। মাকে ছেড়ে যায় ২৮ দিনের মধ্যে। এ প্রজাতি ১-২ মাসের মধ্যে যৌন ক্ষমতা অর্জন করে। বছরে স্ত্রী ইঁদুর ৪২টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে।

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status) :

ক্ষতির তীব্রতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুরের মধ্যে সলই/নেংটি ইঁদুরের স্থান তৃতীয়। দেখতে ছোট হলেও ঘরবাড়ী ও গুদামের খাদ্যশস্যের ব্যাপক ক্ষতি করে। জামা কাপড়, লেপ তোষক, বৈদ্যুতিক তার, কম্পিউটার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

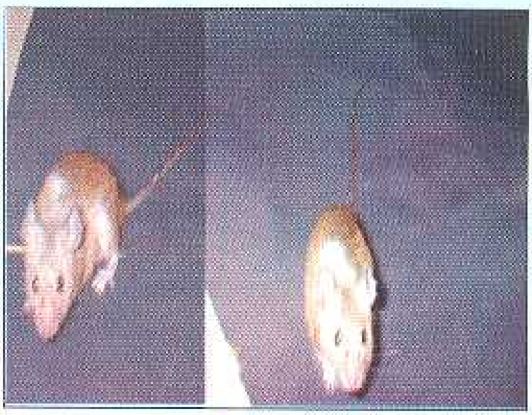

বাস্তি বা নেংটি ইঁদুর (*Mus musculus*)

প্যাসিফিক ইঁদুর/ পলিনেশিয়ান ইঁদুর (*Rattus exulans*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী (General characteristics) :

ছোট, লালচে বাদামী হতে ধূসর বাদামী রঙের ইঁদুর। পৃষ্ঠদেশের লোম লালচে বাদামী এবং পেটের পশম ক্রীম অথবা সাদা অগ্রভাগ ও গোড়া ধূসর রঙের হয়। মুখের গোঁফ অতি লম্বা হয় এবং যখন পিছনে ভাজ করে তখন কান ছাড়িয়ে যায়। লেজ সাধারণত মাথা ও দেহের চেয়ে লম্বা হয়। লেজের উপর ও নীচ একইভাবে সমান কালো হয়। পিছনের পায়ের উপরিভাগ সাদা হয়। এ প্রজাতির ইঁদুর অন্য যে কোন র‍্যাটাস (Rattus) ইঁদুরের চেয়ে ছোট হয়। অনেক সময় এদের সলই (Mouse) ইঁদুর হিসেবে ভুল শনাক্ত করা হয়ে থাকে। পিছনের পায়ের ভিতরের দীর্ঘায়িত মেটাটার্সাল প্যাড একটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি দ্বারা প্যাসিফিক ইঁদুরের (*R. exulans*) এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ও সকল মাস্ প্রজাতি (গোলাকার প্যাডসহ) হতে শনাক্ত করা হয়।

বিস্তৃতি (Distribution) : এশিয়ার মূল-ভূখন্ড হতে বাংলাদেশের পূর্বাংশে হতে কেন্দ্রীয় ভিয়েতনাম এবং মালে পেনিসোলা, ইন্দোনেশিয়ার সকল প্রধান এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র দ্বীপ, ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি রয়েছে। এসব স্থানের মাঠে ও গ্রামের প্রধান ইঁদুর বাংলাদেশে এদের সংখ্যা (পপুলেশন) কম রয়েছে।

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior) :

অত্যাধিক বৃক্ষবাসী। এদের লম্বা মাপের গাছে এবং দেওয়ালে, ঘরের ছাদে প্রায়ই আরোহন করতে দেখা যায়। এ প্রজাতির ইঁদুর সাধারণত গ্রামে এবং বসতবাড়ীর বাগানে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত পাতা বা আগাছা দ্বারা বাসা তৈরী করে। দালানের ভিতরে বাসা সাধারণত খড়, পাতা ইত্যাদি দ্বারা বাসা করে। ছাদেও অবস্থান করে। নারিকেল বাগানে ১১-২৪টি ইঁদুর প্রতি হেক্টরে এবং আবাস ভূমিতে ৭-৩০ টি প্রতি হেক্টরে পাওয়া গিয়েছে।

জীবন বৃত্তান্ত (Biology) :

সারা বছর ধরে প্রজনন করে থাকে। গর্ভধারনকাল ১৯-২৩ দিন। অন্ধ, লোম বিহীন, বন্ধকর্ণ বিশিষ্ট বাচ্চার ওজন ২.৮-৩.১ গ্রাম হয়। কানের পিনা খোলে ২.৫ দিন পর। লোম দৃশ্যমান হয় ৩.৫ দিনে। ছেদন দাঁত উঠে ৭-১১ দিন পর। চোখ খোলে জন্মের ১২-১৫ দিনে এবং মাকে ২১/২৮ দিন পর ছেড়ে যায়। স্ত্রী ইঁদুরের দেহের ওজন ৩০ গ্রামের বেশি হলেই যৌনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গর্ভধারণ করতে পারে। স্তন: ১+১+২ জোড়া থাকে। সাধারণত ১-৭ টি বাচ্চা প্রসব করে গড়ে ৪টি বাচ্চা হয়। একটি স্ত্রী ইঁদুর গড়ে ১৭-২৫ টি বাচ্চা প্রতি বছর প্রদান করে।

প্যাসিফিক ইঁদুর (*Rattas exulans*)

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status) :

গুদামজাত খাদ্য শস্যের ক্ষতি করে থাকে। নারিকেল ও অন্যান্য ফলের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। মূল জাতীয় শস্য, শাকসবজী যেমন সীম এর ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনসের কিছু অংশে ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে এরা নারিকেলের ক্ষতি করে থাকে।

মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর (*R.terricolor*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী (General characteristics)

এদের পশম নরম; সামনের ও পিছনের পা বিশুদ্ধ সাদা হয়। এ প্রজাতির ইঁদুরের লেজের উপরিভাগ নিচের চেয়ে পার্থক্য পূর্ণ কালো হয়। পৃষ্ঠ দেশের লোম বা পশম উজ্জ্বল হলদে বাদামী এবং পেটের পশম বিশুদ্ধ সাদা রঙের হয়। লেজ সাধারণত প্রায় ১০ মি.মি. লম্বা তবে মাথা ও দেহের চেয়ে ছোট হয়। এ প্রজাতির ইঁদুরের পিছনের পা দুইটি পার্থক্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শক্তিশালী খনন কাজের উপযোগী কিন্তু আরোহনের উপযোগী নহে। নীচু প্লান্টার প্যাড এবং অগ্রে নিক্ষেপ নখর রয়েছে। উভয় স্তনের সংখ্যা ১+২+২ জোড়া থাকে। লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও দেহের চেয়ে কম।

বিস্তৃতি (Distribution)

মাঠের খাটো সলই ইঁদুর ভারতের উপদ্বীপ, পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ এবং উত্তর নেপালে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত রয়েছে। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে এ প্রজাতিটি পাওয়া গেছে। কিন্তু দেশের অন্যত্র পাওয়ার কোন গবেষণা তথ্য নেই।

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior)

সেচকৃত ধান এবং মিশ্র শাকসবজী শস্য ক্ষেতে পাওয়া যায়। কুমিল্লা জেলায় মাঠের সলই ইঁদুর বালু মাটির শাকসবজীর মাঠে গর্তে পাওয়া যায়। এদের গর্ত জটিল শাখাযুক্ত এবং বহু প্রবেশ পথ থাকে। এতে ২-৪ টি প্রবেশ পথ এবং বাসায় ১-২টি কক্ষ থাকে। এরা গর্তে খাদ্য সঞ্চয় করে। গর্তে ৭ গ্রাম পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

জীবন বৃত্তান্ত (Biology)

এ প্রজাতির ইঁদুর সারা বছরই বাচ্চা দিতে পারে। প্রতিবারে ১-৬টি করে বাচ্চা দিতে পারে। গর্ভধারনকাল ১৯-২২দিন হয়। বাচ্চা প্রদানের বিরতিকাল ৪৫ দিন। স্ত্রী বাচ্চার বয়স দুই মাস পূর্ণ হলেই যৌন/প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। গর্ভধারনের হার সারা বছর প্রায় ২০ ভাগ থাকে। বর্ষা মৌসুমে গর্ভধারন হার ৭০% বেশি হয়।

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status)

দানা শস্য এদের প্রধান খাদ্য। শাকসবজীর ক্ষতি করে থাকে। এ প্রজাতির ক্ষতির পরিমান পরিসংখ্যানগত কোন তথ্য জানা নেই।

মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর (*Mus booduga*)

বাঁশের ইঁদুর (*Cannomys badius*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি (General characteristics)

খর্ব ও বলিষ্ঠ প্রাণী। এদের বৃহদায়তনের প্রশস্ত মাথা। খাটো পা সহ বেশ মোটাসোটা দেহ হয়। সামনের এবং পিছনের পায়ে শক্তিশালী নখর আছে। এদের লেজ ছোট হয়। এদের শনাক্তকরন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিরাট ছেদন দাঁত। ছোট চোখ ও কান এবং লেজে বিরলভাবে বিক্ষপ্ত পশম যা কোঁচকানো চামড়াকে আবৃত করে রাখে। পশম লালচে বাদামী রঙের হয়। এদের কান অত্যাধিক ছোট (১০ মি.মি. এর কম) যা পশমের নীচে লুকায়িত ভাবে থাকে। সামনের পা এবং পিছনের পায়ের প্লানটার প্যাড দানা যুক্তের পরিবর্তে মসৃণ হয়। স্তন: ১+১+২ জোড়া থাকে।

বিস্তৃতি (Distribution) :

বাঁশের ইঁদুরের উঁচুভূমি নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভারতের পূর্বাংশে, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাউস, ক্যামবোডিয়া এবং ভিয়েত্নামের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি রয়েছে। বাংলাদেশের বাঁশের ইঁদুরের কোন জরিপ তথ্য নেই।

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior) :

বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উঁচু ভূমির বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাকৃতিক বাঁশের বনে বাঁশের ইঁদুরের অধিক আধিক্য রয়েছে। বাংলাদেশে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি অঞ্চলের বাঁশে ইঁদুরের সমস্যা রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে বাঁশের ইঁদুরের গর্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ সাধারণত বর্হিভাগের নিকট পর্যন্ত গিয়ে থাকে যা সম্ভবত একটি জরুরিকালীন সময়ের অসম্পূর্ণ বর্হিগমন পথ হিসেবে ব্যবহার করে। গর্তে অবস্থানের সময় সক্রিয় প্রবেশ পথ তাহা মাটির পাইল দ্বারা বন্ধ থাকে।

চিত্র : বাঁশের ইঁদুর (*Cannomys badius*)

জীবন বৃত্তান্ত (Biology) :

গর্ভধারন কাল ২২দিন। প্রজাতি ভেদে বাচ্চার সংখ্যা ৩-৫টি হয়। জন্মের প্রায় ১০-১৩দিন পরে পশম জন্মায়। এদের চোখ খুলে ২৪ দিনে। জন্মের ১-৩ মাস পরে মাকে ছেড়ে যায়। বন্দিদশায় জীবনকাল প্রায় ৪ বছর হয়। লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও দেহের চেয়ে ছোট। পূর্ণ বয়স্ক ইঁদুরের ওজন ৫০০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে।

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status) :

লেখকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এরা উঁচু ভূমির ধান, আখ, কাসাভা এবং তরমুজ এর ব্যাপক ক্ষতি করে। বাংলাদেশে ঝুম ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যে বছর বাঁশে ফুল আসে সে বছর ইঁদুরের পপুলেশন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে অর্থাৎ ইঁদুর বন্যা হয়। তখন বান্দরবনে, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি অঞ্চলের বাঁশের ইঁদুর দ্বারা বিভিন্ন শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতির পর্যায় এত ব্যাপক যে ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

চিকা (*Suncus murinus*)

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি (General characteristics)

চিকা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী নহে। এরা পতঙ্গভোজী Insectivora বর্গের এবং সুরিসাইড পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। চিকার উদ্ভট দুর্গন্ধের জন্য পরিচিত। রাত্রিকালে উদ্ভট শব্দ এবং পরিচালনার সময় কামড়ানোর প্রবনতা বসতবাড়ীতে বালাই হিসেবে অতি পরিচিতি রয়েছে। এরা মাঝারী ধরনের বড়, ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণী। চিকার চোখ অতি ছোট এবং একটি লম্বা সহজে পরিবর্তনশীল নাক রয়েছে। বাংলাদেশের চিকার লেজ খাটো হয়। এদের সমস্ত দেহ ধূসর বাদামী হতে মসৃণ-ধূসর রঙের হয়। লেজ বেশ কিছুটা মাথা ও দেহের চেয়ে ছোটতর হয়।

বিস্তৃতি (Distribution) : অস্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ড, এ্যান্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, দি-আর্কটিক, আইল্যান্ড, দি ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং কিছু সংখ্যা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই চিকা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে গ্রাম, শহর এবং বন্দরের সর্বত্রই এদের উপস্থিতি রয়েছে। চিকার ২৬৬টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে চিকার দু'টি প্রজাতি গেছো। প্রজাতিগুলো হচ্ছে (ক) গেছো ছুঁচো (*Tupaia gils*) মধুপুরের শালবনের বাঁশ ঝাড়, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বনে পাওয়া যায়। (খ) চিকা (*Suncus murinus*) : বাংলাদেশের সর্বত্রই কম বেশি দেখা যায়।

নিবাস ও আচরন (Habitat and behavior) : এরা আরোহনের দুর্বল দক্ষতার একটি ভূচর প্রজাতি। মানুষের আবাসভূমিতে এলাকাতে সাধারণত অধিক পরিমানে অবস্থানের জন্য এদের নাম করন হাউজ শ্রু (House shrew) সুপারিশ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র চিকারা সাধারণত এক রাত্রে ৪০০ মিটারের অধিক দূরত্ব পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন করতে পারে। ভেজা অথবা স্যাঁতসেঁতে স্থান যা অনেক গাছ পালায় আবৃত থাকে প্রচুর অমেরুদন্ডী প্রাণী রয়েছে সে সকল স্থানে চিকা বেশি পাওয়া যায়। খড়ের গাদা, বাগান, আবর্জনার স্তুপ, পুকুরের পাড়ে এদের বেশি দেখা যায়। এছাড়া ইঁদুরের পুরাতন গর্তে বাসা বাঁধে। দেওয়ালের ফাঁকে, গাছের গোড়ায় এদের বেশি দেখা যায়। বাচ্চা প্রদানের সময় শুকনা ঘাস, গাছের পাতা, খড় অথবা অন্যান্য সুবিধাজনক জিনিষ দিয়ে বাসা বাঁধে।

চিকা সন্ধ্যা ও ভোর বেলায় খাদ্য শিকারে বেশি তৎপর থাকে। তবে নীরব স্থানে দিনের বেলায় খাদ্য শিকারের চেষ্টা করে। চিকা সাধারণত প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য শিকারে বের হয়ে থাকে।

চিকা (*Suncus murinus*)

জীবন বৃত্তান্ত (Biology) : সারা বছরই প্রজনন করতে পারে। চিকা তিন মাস বয়সে গর্ভধারন করে। গর্ভধারন কাল ৩০দিন চিকা বাচ্চা প্রসব করার ১-৪ দিনের মধ্যে পুনরায় গর্ভধার করতে পারে। লোমহীন ও অন্ধ বাচ্চা প্রসব করে। সর্বোচ্চ ৯-১১টি বাচ্চা এবং প্রতিবারে গড়ে ৩-৪টি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা চোখ ফোঁটে। বাচ্চার বয়স ২৫ দিন হলে তারা মায়ের নিকট হতে আলাদা হয়ে যায়। জীবন কাল ১-৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

ক্ষতিকর ভূমিকা (Pest status) : প্রকৃতিতে চিকার উপকারী ও অপকারী ভূমিকা উভয়ই আছে। উপকারী ভূমিকা ঃ মানুষের বাসস্থানের এলাকার ক্ষতিকারক পোকামাকড়, যেমন- তেলাপোকা, পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকা মাকড় খেয়ে থাকে। ধান চাষের মৌসুমে এদের পাকস্থলীর দ্রব্যের শতকরা ৮১.৪ ভাগ কীট পতঙ্গ পাওয়া গেছে। ফসলের মাঠে চিকার ক্ষতিকারক ভূমিকা নেই।

অপকারি ভূমিকা ঃ চিকার মূগনাভি হতে বের হওয়া খারাপ গন্ধের মাধ্যমে অথবা মলমূত্র ফেলে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট এবং ঘরবাড়ি নোংরা করে। ঘরের খাবার নষ্ট করে। বাংলাদেশের গবেষণায় পাকস্থলিতে ভাত/চাউল পাওয়া গেছে।

মানুষ ও পশু পাখির ক্ষতিকারক নানা প্রকার অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক রোগ বিস্তারকারী পরজীবী পোকার অন্যতম বাহক। চিকা প্লেগ ব্যাসিলস সহ অন্যান্য রোগের জীবানু বহন ও বিস্তার করে।

চিকা ঘরবাড়ি, বাসস্থানের পরিবেশকে দূষিত করে।

চিকা (*Suncus murinus*)

ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি (০২.৩০-০৩.৩০) (Nature of rat damage)

ইঁদুরকে সাধারণত সর্বভূক (Omnivorous) : প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এরা একের অধিক খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এজন্য এদের উচ্চ শক্তি প্রদানকারী খাদ্য বেশি পছন্দ করে যেমন-দানাদার ও বীজ জাতীয় খাদ্য তবে কম শক্তি প্রদানকারী খাদ্য খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। ইঁদুর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মৌলিক উদ্দেশ্য শস্য উৎপাদনে ইঁদুরের প্রভাব কমানো। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা (রোডেন্টস) শস্য উৎপাদনের যে কোন স্তরে এবং গুদামে আক্রমন করতে পারে। এদের প্রভাবকে দু'টি উপাদানে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ

শস্য কর্তনপূর্ব প্রভাব (Pre-harvest impact) : শস্যের বর্ধনস্তর হতে কর্তনে যাওয়া পর্যন্ত ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির কারণ।

শস্য কর্তনোত্তর প্রভাব (Post-harvest impact) : গুদামে সংরক্ষণ কালীন সময়ে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির কারণ।

ঘরবাড়ী, গুদাম, মুরগীর খামারে, দোকানে, হোটেলে, শিল্প কারখানায় ও ফসলের মাঠে ইঁদুরের উপস্থিতির নির্দেশক অথবা লক্ষণ।

১। মল (Dropping) : চলাচলের রাস্তায়, আশ্রয়স্থলে এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে ইঁদুর গমন করে সেখানে মল দেখতে পাওয়া যায়। মল দেখে ইঁদুরের আকার ও প্রজাতি শনাক্ত করা যায়।

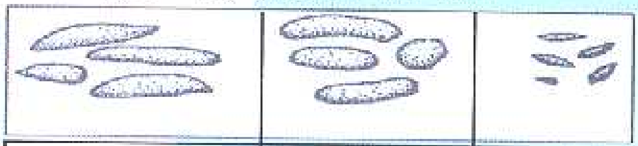

গেছো ইঁদুরের মল	মাঠের কালো ইঁদুরের মল	সলই ইঁদুরের মল

২। গর্ত (Burrows) : ঘরে বা তার পাশে, দেওয়ালে, খড়ের গাঁদার পাশে, উঠানে, বাগানে, ফসলের মাঠে, আইলে, অন্যত্র ইঁদুরের মাটি অথবা গর্ত দেখে ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায়।

চিত্র : সতেজ ইঁদুরের গর্ত

৩। ইঁদুরের চলাচলের রাস্তা (Runways) : ইঁদুর যেখান দিয়ে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বার বার যাতায়াত করে সেখানে পথের সৃষ্টি হয়।

চিত্র : ইঁদুরের চলাচলের রাস্তা

৪। কর্তন (Gnawing) : ইঁদুরের ক্ষতির লক্ষণ শনাক্ত করন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পোকামাকড়, পাখি এবং বড় স্তন্যপায়ী ছাড়া ক্ষতির পার্থক্য নিরূপনের জন্য ধান/গমের ৫-১০ সে.মি. মাটির উপরে কুশির গোড়ায় কাটে ফেলে রাখা পরিচ্ছন্ন কর্তিত পৃষ্ঠদেশ ৩০-৪৫° কোন বিশিষ্ট ধারন করে।

চিত্র : ইঁদুরের কর্তনের চিহ্ন

কচি ডাবের মুখের দিকে ছোট ছিদ্র করে (৫সে.মি.) ভিতরের অংশের দ্রব্য খেয়ে ফেলে ফলে ২-৬ দিন পর ডাব বা নারিকেল গাছ হতে ঝড়ে পড়ে।

চিত্র : ইঁদুর দ্বারা ডাবে ক্ষতির লক্ষণ

গোছো ইঁদুর দ্বারা লেবু জাতীয় ফলের ক্ষতির লক্ষণ

টমেটোর ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির লক্ষণ

গুদামে খাদ্যের ক্ষতির চিহ্ন

নোংরা দাগের চিহ্ন

মল ও মূত্র গুদামের খাদ্য নষ্ট

লাই/ঝুড়ি ক্ষতির চিহ্ন

৫। নোংরা দাগ (Smearmarks)

চলাচলের সময় ইঁদুরের দেহের নোংরা বস্তু পাইপে, ছাদের কাঠে, দেওয়ালে লেগে দাগ পড়ে যা ভালকরে লক্ষ করলেই বুঝা যাবে।

৬। বাসা এবং কর্তনকৃত খাদ্যাংশ (Nest and food catches)

ইঁদুর যেখানে থাকে সেখানে বাসা বাঁধে। তার আশে পাশে খাদ্যাংশ ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়া ইঁদুরের বাসা দেখেও সহজেই চেনা যায়।

৭। ইঁদুরের গন্ধ (Rat odour)

ঘরে বা অন্য কোথাও ইঁদুরের উপস্থিতি থাকলে উদ্ভট রকমের গন্ধ পাওয়া যায়।

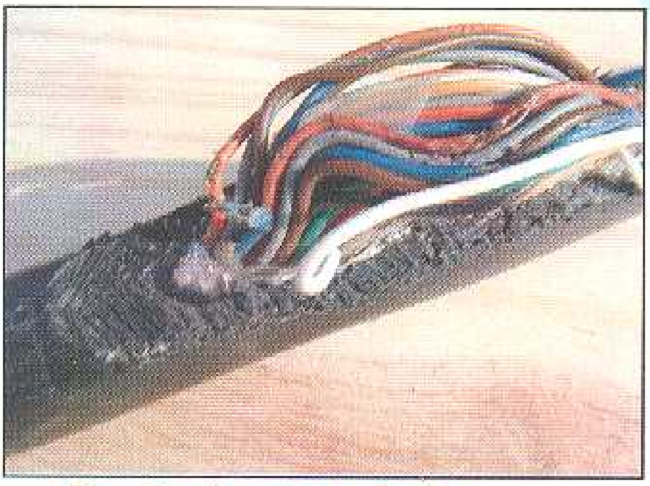

চিত্র : বৈদ্যুতিক তারের ক্ষতির চিহ্ন

চিত্র : ইঁদুর দ্বারা ভূট্টার ক্ষতি

চিত্র : ইঁদুর দ্বারা বালিশের ক্ষতি

চিত্র : ইঁদুর দ্বারা মিষ্টি কুমড়ার ক্ষতি

চিত্র : ইঁদুর দ্বারা কার্পেট এর ক্ষতি

চিত্র : ইঁদুর দ্বারা আনারসের ক্ষতি

ইঁদুরের ক্ষতি পরিমাপ (Estimate Rat damage)

ইঁদুরের দ্বারা ফসল ও সম্পদের বিপুল পরিমান ক্ষয়ক্ষতি হয়। সকল ফসল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সঠিকভাবে নির্ণয়ন করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে প্রতি বছর ইঁদুর দ্বারা যে ক্ষতি হয় তার পরিমান ২৫টি গরীব দেশের মোট জিএন পি এর সমান হবে। ইঁদুরের ক্ষতির পরিমান নির্ভর করে উপস্থিত ইঁদুরের সংখ্যার উপর। বেশি ইঁদুরের উপস্থিতি মানে ফসল ও সম্পদের ক্ষতি বেড়ে যাওয়া। কারণ প্রতিটি ইঁদুর তার দেহের ওজনে ১০% খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত বড় ইঁদুর প্রতিদিন ২০-৩০ গ্রাম এবং ছোট ইঁদুর ২-৫ গ্রাম খাদ্য খেয়ে থাকে। এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে ৬-৭ গুন নষ্ট করে।

ঘরে ইঁদুর উপদ্রবের তীব্রতা (Severity of rat infestation) ইঁদুরের উপদ্রবের তীব্রতা তিন প্রকার হতে পারে, যথা-

অল্প (Few) : ঘরে বা গুদামে ছোট অথবা বড় ইঁদুরের উপস্থিতির অল্প সংখ্যক মলের ভিত্তিতে। জীবন্ত ইঁদুর দেখা যাবে না এবং শস্যের ব্যাগে বা অন্য জিনিসে ক্ষতির চিহ্ন থাকবে না।

মধ্যম (Medium) : খাদ্য শস্যের মধ্যে ইঁদুরের মল পাওয়া যাবে, ব্যাগে অল্প ক্ষতির চিহ্ন, জীবন্ত ইঁদুর দেখা যাবে, অল্প সংখ্যক গর্ত গুদামে বা ঘরের বাহিরে দেখা যাবে।

ব্যাপক (Severe) : অসংখ্য মল যত্রযত্র দেখা যাবে। জীবন্ত ইঁদুর চোখে পড়বে। ঘরের ভিতর ও বাহিরে গর্ত দেখা যাবে। শস্যের ও অন্যান্য জিনিসের ক্ষতি চোখে পড়বে।

শস্য কর্তন পূর্ব ক্ষতি বা লোকসান নির্ণয় (Estimating Preharvest crop Damage)

বড় ইঁদুর সাধারণত শীষ ধারনকারী কুশির গোড়ার দিকে কাটে, ফেলে রাখা পরিচ্ছন্ন কর্তিত পৃষ্টদেশ ৩০-৪৫° কোণ বিশিষ্ট ধারন করে। এরা পতিত শীষ খেয়ে থাকে অথবা কুশি ধীরে ধীরে বহন করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। যেমন গর্তে। ছোট ইঁদুর (যেমন মাস প্রজাতি) কুশিতে আরোহন করে শীষ কেটে ফেলে অথবা সেখানে শিষ না কেটে স্বতন্ত্র দানা অপসারন করে খেয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতির যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

দানাদার শস্যের ক্ষতি পরিমাপ

ফসলের অকর্তিত কুশি, সদ্য কর্তিত, পূর্ব কর্তিত এবং পুনরায় আবির্ভূত অথবা পূর্ব কর্তিত এবং পুনরায় জন্মানো অথবা পুনরায় জন্মায় নাই এমন কুশির সংখ্যা রেকর্ডের মাধ্যমে কুশির ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় বা ধারনা পাওয়া যায়। শস্য কর্তন পূর্ব ক্ষতি পরিমাপের জন্য শীষ স্তরে একবার এবং পুনরায় কর্তনের পূর্বে একবার জরিপ করতে হবে। থোর স্তরে ইঁদুরের ক্ষতির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যার প্রতিফলন প্রতিবেদনে এবং মাঠ পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায়।

শাকসবজি এবং শস্যের ক্ষতির পরিমাপ

ফল, কন্দ অথবা ভুট্টার মোচা এবং সীম জাতীয় শস্যের ক্ষতির প্রভাবিত করে এবং বর্ধন স্তরে যেকোন তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হয়। কারণ একটি ক্ষতিগ্রস্থ কন্দ অথবা ফল সাধারণত ভক্ষণ অথবা বিক্রয়ের জন্য বিবেচনা করা যায় না। এক্ষেত্রে ক্ষতি গ্রস্থের সংখ্যা বনাম ক্ষতি ছাড়া ফল অথবা কন্দ গণনার মাধ্যমে সঠিক পরিমাণগত ক্ষতির পরিমান নিরূপন করা যায়।

নারিকেল : কচি নারিকেল (ডাব) ইঁদুর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার কারনে নীচে পড়ে যাওয়ার পর হিসেব রাখতে হবে। ক্ষতি গ্রস্থ ডাব ও গাছে ভাল ডাবের সংখ্যা গণনা করে প্রতি গাছে ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা যাবে।

শসা/লাউ/কুমড়া : প্রত্যেক ফসলের ক্ষতি গ্রস্থ ফল ও ভাল ফলের হিসেব করে ক্ষয়ক্ষতির শতকরা হিসেব বের করতে হবে। কর্তনের ক্ষতি এবং লোকসান নির্ণয় (Estimating post Harvest damage)

সংরক্ষণকৃত শাকসবজী অথবা ফলে কামড়ানোর স্পষ্ট লক্ষণ হতে সাধারণত কর্তনোত্তর ক্ষতি নির্ণয় করতে হবে। গুদামজাত দানাদার শস্যের ক্ষতি মল, পশম অথবা মূত্রের নোংরার উপস্থিতি দ্বারা নিরূপন করতে হয়।

কর্তনোত্তর লোকসান বা ক্ষতির ক্ষেত্রে ইঁদুরের প্রভাবের সাধারণত কদাচিৎ হিসেব করা হয়। এ পরিস্থিতিতে দু'টি বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে থাকে। প্রথমত ঃ কর্তনোত্তর (Postharvest) মোট ক্ষতির যে কোন গ্রহণযোগ্য পরিমাণ নির্ণয় করার অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ গুদামের দানা শস্যে ইঁদুরের ক্ষতি অন্যান্য বালাই জনিত ক্ষতি হতে শনাক্ত করা কঠিন হয়।

- ❑ শস্য সংরক্ষণ এলাকায় পাত্রস্থাপনের মাধ্যমে ইঁদুরের ক্ষতি নির্ণয়
- ❑ ব্যাস ও ওজন জানা একটি প্রশস্থ বন্ধ-ওয়েভ ঝুড়ি নির্বাচন করতে হবে।
- ❑ ভাল ধান ৫-১০ কেজি মেপে ঝুড়িতে রাখতে হবে।
- ❑ মজুত পাত্রের উপরে এ ধান রাখতে হবে।
- ❑ মজুত পাত্র ধানের গুদামে স্থাপন করতে হবে।
- ❑ এ ঝুড়িতে মজুদের মালিককে ধান প্রদান বা বাহির না করার জন্য নিষেধ করতে হবে।
- ❑ ঝুড়িসহ ধানের ওজন ৭দিন/ ১৫ দিন অন্তর অন্তর গ্রহণের মাধ্যমে দানা শস্যের ক্ষতির হারে চার্ট তৈরী করতে হবে।
- ❑ ঝুড়িসহ ধানের ওজন নেওয়ার সময় ধানের পরিমাণ ১ কেজি/২কেজিতে নেমে গেলে পুনরায় ঝুড়িতে ধান দিয়ে ভর্তি করে পূর্বের মূল ওজনের সমান করতে হবে।
- ❑ প্রত্যেক সময় মানসম্পন্ন মাঠ মানদন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুড়িতে রাখা ধান এবং খাদ্যশস্য মজুতকৃত পৃষ্ঠদেশের দানা শস্যের আদ্রতা পরিমাপ করে রেকর্ড করতে হবে।
- ❑ শস্য গুদামে ইঁদুরের কোন প্রজাতি ক্ষতি করছে তা ফাঁদের মাধ্যমে ধরতে হবে এবং মলের আকার ও গঠন অনুসারে শনাক্ত ও শ্রেণী করন করতে হবে।
- ❑ গ্রামে শস্য সংরক্ষণের সময়ের উপরও ইঁদুরের ক্ষতির তারতম্য ঘটে। যে সকল কৃষক তাঁদের প্রতিবেশীদের শস্য মজুত অথবা ক্রমাগত ভাবে দীর্ঘসময় ধরে খাদ্য মজুত রাখে তাদের শস্যে এ সময়ে ক্ষতির হার প্রতিবেশিদের চেয়ে বেশি হয়।

মজুতের সমস্ত সময়ের ক্ষতির হার নিরূপন ঃ
ঝুড়ি হতে ধানের খেয়ে সাবার করার (Consumption) হারের হিসেবই প্রতি একক পৃষ্ঠদেশের আয়তনের ক্ষতির হার হবে (উদাহরণ স্বরূপ যদি ০.৫ কেজি ধান ৮ সপ্তাহ সময়ে পৃষ্ঠ দেশের আয়তনে ০.৫ বর্গমিটার মধ্যে ঝুড়ি হতে অপসারিত হয়। তখন ক্ষতির হার ০.১২৫ কেজি/ বর্গমিটার/ ৩ সপ্তাহে হয়। এ মানকে পারিবারিক শস্যের গুদামের পৃষ্ঠদেশের আয়তন দিয়ে গুণ করে ঐ গুদামের শস্যের সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ প্রদত্ত নমুনার সময়ের জন্য হিসেব করতে হবে।

ইঁদুর-বাহিত রোগের ক্ষয়ক্ষতি

২০০টির অধিক রোগের ক্ষুদ্র জীবানু, কৃমি এবং আর্থ্রোপডস এর বর্ণনা প্রধান তিনটি ইঁদুর প্রজাতি ঘরের ইঁদুর, গেছো ইঁদুর নরওয়ে ইঁদুরের মধ্যে পাওয়া গেছে। জাভভেদে ২০০১ সনে ২২৫টি প্লেগের ঘটনা ধরা পড়েছে। থাইল্যান্ডে ২০০০ সনে লেপটোস্পাইরোসিস রোগে ১৪০০ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল এদের মধ্যে ৩৬৫ জন মারা গিয়েছিল। ইঁদুরের রক্ত পরীক্ষায় ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে হানটান ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে। থাইল্যান্ডে ২০০১ সনে ৫০০০ জনের মধ্যে ৯জন র‍্যাইটাইপাস রোগে মারা গিয়েছিল। এশিয়ার অন্যত্রও এসব রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

ইঁদুর জাতীয় প্রাণী রোগজীবাণুর বাহক (০৩.৪৫-০৪.৪৫) (Rodent as a disease Carriers)

বন্যপ্রাণীর রোগ সম্পর্কিত জ্ঞানকে অনেক সময় বিস্তারিত ভাবে জুনোটিক রোগ (Zoonotic Diseases) অথবা জুনোসেস (Zoonoses) বলা হয়। এসব রোগগুলো প্রাণী পোষক এবং মানুষের মধ্যে বিস্তার ঘটে। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা (রোডেন্টস) অনেক ধরনের জুনোটিক রোগ বহন করে যেমন প্লেগ, অ্যাইরোসিস। ইঁদুর ৬০টিরও বেশী রোগের জীবাণু বহন করে থাকে। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৯ এর মধ্যে ২৫টির অধিক নতুন হানটাভাইরাসেস (Hantaviruses) এবং অ্যারনাভাইরাসেস (Arenaviruses) ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর (রোডেন্টস) মধ্যে শনাক্ত হয়েছে।

- ইঁদুর-বাহিত রোগের ধারা বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণগুলো হচ্ছে :
- গ্রাম এবং শহরের মধ্যে মানুষের অবস্থানের পরিবর্তন;
- দেশ সমূহের মধ্যে মানুষের অবস্থানের পরিবর্তন;
- মানুষের পপুলেশনের নিবিড়তা বা পপুলেশনের মাধ্যমে রোগ বিস্তারের শক্তি যোগায়;
- প্রাকৃতিক পরিবেশ (বনের গাছ পালা/ খালি/ পরিষ্কার করনের কারণে) রোডেন্টের প্রাদুর্ভাব এখন মানুষের সংস্পর্শে এসেছে।

সাধারণত প্রধান তিন দলের কৃমি ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে মানুষে বিস্তার ঘটে থাকে। যথা-

১। নলাকৃতি কৃমি বা নিমাটোড (Nematode): এ কৃমি ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত, বৃহদান্ত্র, সিকাম, যকৃত, ফুসফুস এবং দেহ গহ্বরে সাধারণত দৃষ্ট হয়। এদে পিন্ড, বৃক্ক, চোখ, মুখ, জিহ্বা, অন্ত্রনালী এবং পেশী কলাতে কম দেখা যায়।

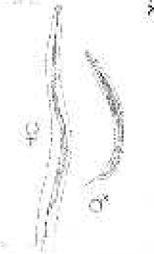

২। পাতা কৃমি (Trematodes) : এরা পোষকের নালী, পিত্তাশয়, ফুসফুস, অগ্নাশয় নালী, ইউরিটার এবং ব্লাডার পাওয়া যায়।

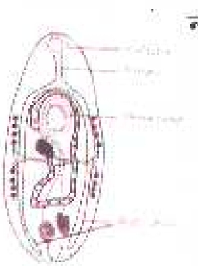

৩। ফিতা কৃমি (Cestodes) : পূর্ণ বয়স্ক ফিতাকৃমি ইঁদুরের মস্ত অন্ত্র জুরে পাওয়া যায়। ফিতাকৃমির শূককীট ফুসফুস এবং যকৃত অঙ্গে পাওয়া যায়।

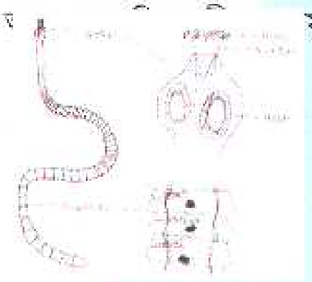

এ সকল কৃমি ইঁদুরের মলমূত্রের মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বিস্তার ঘটে থাকে।

ইঁদুর বাহিত ভাইরাস এবং অণুজীব রোগ সমূহ (Viruses and microbial disases) : ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা নানা রকম ভাইরাস এবং ভাইরাসের জীবানু বহন ও বিস্তার ঘটাতে পারে।

রক্তক্ষরাজ্বর (Hantaan Virus) : পৃথিবীর অনেক অংশের শহরের ইঁদুরের পপুলেশনে হানট্যান ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ রোগের বিষয়ে কোন গবেষণা তথ্য নেই। এ ভাইরাস পোষক হতে পোষকে আক্রান্ত লালা, মূত্রে এবং মলের মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বিস্তার ঘটে থাকে।

টিক টাইফাস (Rickettsia conori) : কুকুর এ রোগের জন্য প্রধান ভান্ডার বা বাহক, কিন্তু ইঁদুরও গুরুত্বপূর্ণ আধার বা বাহক হিসেবে কাজ করে। এ রোগে আক্রান্ত টিক (Tick) মানুষকে কামড়ালে সংক্রমন ঘটে। সমস্ত এশিয়াতে টিকের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে থাকে।

স্ক্রাব টাইফাস (Orientia tsutsugamusthi) : এ রোগের প্রধান ভান্ডার ও বাহক হচেছ ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। ট্রোমবিকুলিড (Trombiculid) গণের নানা প্রকার মাকড়ের শুককীট যা চিকার নামে পরিচিত, তাদের কামড়ে মানুষের মধ্যে রোগ সংক্রমিত হয়। মানুষের মৃত্যুর হার কম হবে যদি প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

মিউরিন টাইফাস (Rickettsia typhi) : সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এর প্রাদুর্ভাবের রিপোর্ট রয়েছে। এ রোগের বিস্তার **ঘটে ফ্লির (Flea) :** কামড়ে অথবা আক্রান্ত মলের অথবা দুমড়ে মুচড়ে ফ্লির মাধ্যমে।

স্পটেড জ্বর (Rickettsia australis) : এ রোগের অন্যতম বাহক হচ্ছে মাইস (Mice), বান্ডিকেটস (Bandicot) ও অন্যান্য ইঁদুর।

লেপটোস্পাইসিস (Leptospirosis) : এ জুনোটিক রোগের জীবানুর বাহক ও বিস্তারকারী সকল প্রজাতির মাঠে ইঁদুর। মানুষে সংক্রমন ঘটে যখন একটি খোলা ক্ষতস্থান ইঁদুরের প্রশ্রাব (Urine) দ্বারা দূষিত পানি, আদ্র মাটি অথবা উদ্ভিদ সংস্পর্শে আসে। এ রোগের লক্ষণ ইনফ্লুয়েনজা রোগের অনুরূপ হয়। এ রোগের জীবাণু কয়েকদিন হতে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত টিকে থাকে। এ রোগের লক্ষণকে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুজ্বর হিসেবে ভাবা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুল রোগ নির্ণয় করে থাকে। যারা রোপনকৃত গাছপালা, অথবা ফসলের মাঠে কাজ করেন তাদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

ইঁদুরের কামড়ানো জ্বর (Spirillum Minor) : স্পাইরোটিকস (Spirochaete) এর কারনে এ রোগ হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের কামড়ানোর দ্বারা এ রোগের সংক্রেমন ঘটে। পৃথিবীর সর্বত্র এ রোগ দেখা যায়। অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত এ রোগ সুপ্তবস্থায় থাকে এবং উপসর্গ লক্ষণ সাধারণত শীত সেরে উঠার বা শুকানোর পরও দেখা দিতে পারে।

প্লেগ (Yersinia pestis) : ইহা একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগের জীবনচক্র হল = স্তন্যপায়ী প্রাণী > ফ্লি > স্তন্যপায়ী প্রাণী। অর্থাৎ আক্রান্ত ইঁদুর > ফ্লি > মানুষ। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা এ রোগের প্রাথমিক পোষক। বার্মা ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশে এ রোগের আক্রান্ত বহু মানুষ মারা গিয়েছে। এ রোগ প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায় তবে এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায়। সালমোনেলোসিস (Salmonellosis) : ইহা একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ/ সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত ইঁদুর জাতীয় প্রাণী মল দ্বারা দূষিত পানি অথবা খাদ্য খেলে এ রোগ হতে পারে। ইঁদুরের অনেক প্রজাতির এ রোগ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasmosis) : এ রোগের কারণ Coccidian বর্গের Toxoplasma gondii প্রজাতি। এ রোগের প্রাথমিক পোষক গৃহ পালিত বিড়াল। ইঁদুর (Rat) এবং মাইস (Mice) সহ অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এ রোগের মধ্যবর্তী বাহক ও বিস্তারকারী

দিবসের মূল্যায়ন (Days Evaluation) : দিনের শেষে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সব প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন। প্রত্যেকের কাছে পুরো সেশনের সব শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিন। যদি কোন বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণার্থী বুঝতে অসুবিধা থাকে তা আলোচনা করুন।

- ❑ প্রশিক্ষণের কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাল লেগেছে তার একটি তালিকা প্রশ্নের মাধ্যমে তৈরী করুন।
- ❑ এর পর প্রশিক্ষণের কোন কোন দিক খারাপ বা ভাল লাগেনি প্রশ্নের মাধ্যমে তার তালিকা তৈরী করুন। প্রশিক্ষণের উন্নয়ন এবং ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশ্নের মাধ্যমে তালিকা তৈরী করতে হবে।
- ❑ পরবর্তী দিনের প্রশিক্ষণের উপস্থিতির সময় বিষয় প্রশিক্ষণার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।
- ❑ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ইঁদুর ধরার ফাঁদ দিতে হবে এবং ফাঁদ ধৃত ইঁদুর আনার জন্য বলতে হবে।
- ❑ একজন দল নেতার মাধ্যমে আজকের প্রশিক্ষণের সমাপ্তি টানার জন্য অনুরোধ জানান।

সবাইকে সালাম, ধন্যবাদ ও আগামী কাল যথাসময়ে প্রশিক্ষণে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানিয়ে প্রশিক্ষণ স্থান ত্যাগ করুন।

দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ সূচী
(Day 2 Training Program)

রোডেন্ট দমন/ব্যবস্থাপনা কৌশলের ধারনা (Concept about rodent control/management techniques)

ইঁদুর ব্যবস্থাপনা পোকা ও রোগ বালাই হতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন রকম। কারণ পোকা ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফসলও পোকা উভয়কে দমন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ফসলও পোকা উভয়কে দমন ব্যবস্থা দেয়া যায়। কিন্তু এখানে ইঁদুরকে শুধু দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর রয়েছে স্বরণশক্তি, পরিবেশ মনিটরিং করার ক্ষমতা, খাদ্য গ্রহণে সচেতনতার স্বভাব, বিষটোপ ও ফাঁদ লাজুকতার সমস্যা। এদের খাদ্যাভ্যাস প্রজাতি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্য একটি মাত্র দমন ব্যবস্থা দিয়ে ততটা কার্যকর হয়না। প্রয়োজন একের অধিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থাৎ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) পদ্ধতি অনুসরনের।

পূর্ব দিনের প্রশিক্ষনের পুনঃ আলোচনা (০৯:০০-০৯:১৫)

রিসোর্স পার্সন শুরুতেই সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ব দিনের গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলো প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে জেনে নিবেন। কোন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশ্ন বা জানার থাকলে তার উত্তর দিবেন।

গত রাতে ফাঁদে ধরা ইঁদুরের প্রজাতি গুলোর প্রশিক্ষণার্থীদের শনাক্তকরন বৈশিষ্ট্যাবলী দেখাবেন। ফাঁদ ব্যবহারের কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা তা জেনে নিবেন। যাদের ফাঁদে ইঁদুর ধরা পড়েছে, কেন ধরা পড়েছে তা সকলকে জানাবেন? যাদের ফাঁদে ধরা পড়ে নাই, কেন ধরা পড়ে নাই সম্ভাব্য কারণগুলো আলোচনা করতে হবে।
এরপর রিসোর্স পার্সন আজকের প্রশিক্ষণের সারা দিনের কর্মসূচি প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট উপস্থাপন করবেন।

রোডেন্ট (ইঁদুর জাতীয় প্রাণী) গ্রাম্য পরিবারের তিনভাবে ক্ষতি করে থাকে। **প্রথমত:** মাঠের সকল কৃষি শস্য খেয়ে; **দ্বিতীয়ত:** গুদামজাত খাদ্য শস্য ভোগ, নষ্ট এবং কুলষিত করে। **তৃতীয়ত:** এরা মানুষ এবং পশু পাখির মারাত্বক রোগজীবাণু বহন করে। প্রতিবছর কর্তনপূর্ণ মাঠ শস্যের ১০-১৫% এবং কর্তনোত্তর ২০% পর্যন্ত ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষতি রোধ কল্পে ইঁদুর দমন করা প্রয়োজন।

ইঁদুর দমন কী? (What is rat control)

যে কোন দমন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সমস্যার মাত্রা সংজ্ঞায়িত করে নেওয়াই হলো উত্তম ধারনা। সাধারণত নিচের ধাপগুলো এর সাথে

জড়িত:
সমস্যার আসল কারণ ইঁদুর (রোডেন্ট) তা নিশ্চিত হওয়া;
জড়িত ইঁদুর প্রজাতি সনাক্তকরা;
মাঠ শস্য এবং গুদামজাত খাদ্য শস্যের ক্ষতির পরিমান নিরূপন করা।

সমস্যা সংজ্ঞার ধাপকে প্রশ্নবোধক সংজ্ঞার ধাপ বলা হয়। এ সময়ে ইঁদুরের প্রজাতির সংখ্যা, কার্যকলাপ এবং শস্য, গুদামজাত খাদ্য ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির পরিমান এবং প্রভাবিত করনের প্রধান বিষয় গুলো সনাক্তকরনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য প্রশ্নগুলো হলো। ইহা কি স্থানীয় সমস্যার অংশে অথবা বৃহৎ এলাকা জুড়ে। প্রতিবছর (রোডেন্ট) পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতি করে কিনা (দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা) অথবা কোন কোন বছর ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি হয়েছে কিনা (তীব্র সমস্যা)? যদি পূর্বোল্লিখিত বছরের ঐ সময় মাঠে দ্রুত বংশ বিস্তারের কারণে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল কিনা অথবা অন্য নিবাস হতে ইঁদুরের আগমন ঘটেছিল কিনা? এ ধরনের বিষয়গুলো পরিবেশ সম্মতভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের প্রধান মূলমন্ত্র।

উদ্দেশ্য হলো: পরিবেশ পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে রোডেন্টের সুযোগ-সুবিধা কমানো এবং মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হলো স্থানীয় জ্ঞান। যদিও অনেক তথ্য, প্রতিবেদন অথবা নথিভূক্ত উৎস হতে পাওয়া যেতে পারে। মূল্যবান ও প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস এবং সমস্যার গভীরতা অবশ্যই কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হতে আসবে।

পরিবেশ বান্ধব ইঁদুর ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল (Ecological based rat management strategies)

ইঁদুর ব্যবস্থাপনা কলাকৌশলের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। অন্যথায় দমন ব্যবস্থা ততটা কার্যকর হবে না। সমন্বিত ইঁদুর ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য উপাদানগুলো নিম্নে দেয়া হল।

১। বালাই প্রজাতি (Pest species) : বালাই প্রজাতির ইকোলজি, জীবনবৃত্তান্ত (Biology), শারীরতাত্তিক (Physiology), আচরন (Behavior) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যেমন কিছু ইঁদুর গর্তে বাস করে (যেমন- মাঠের কালো ইঁদুর, মাঠের বড় কালো ইঁদুর) আবার অন্যান্য প্রজাতি গর্তে বাস করে না (যেমনঃ গেছো ইঁদুর, সলই ইঁদুর)। এদের পরিবেশ ও বিভিন্ন হয়। তাই দমন ব্যবস্থা ও ভিন্ন হয়। প্রজাতি ভেদে খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্য রয়েছে। যেমন ব্যান্ডিকট দলের প্রজাতি সহিত *Mus* দলের ইঁদুরের প্রজাতির খাদ্য গ্রহনের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য আছে।

২। পরিবেশ (Environment) : এক্ষেত্রে খাদ্যের উৎস (Food sources), পতিতস্থান বা আবর্জনাপূর্ণ স্থান (Refuge area), আবহাওয়া (Climate) এবং বাইয়োটাইপস (Biotypes) ইত্যাদির পরিবেশ বুঝায়। যদি খাদ্যের উৎস বেশি থাকে সেক্ষেত্রে ইঁদুরের পপুলেশন ও সহজেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তিনটি মৌলিক জিনিস যেমন খাদ্য, পানি ও বাসস্থানের উপর ইঁদুরের বংশ বিস্তারের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। এ তিনটির একটির অভাব হলে ইঁদুর সেখানে থাকবে না। বর্ষার সময় মাঠের ইঁদুর উচুস্থান এবং ঘরবাড়ীতে চলে আসে। আবার বর্ষা কমে গেলে ফসলের মাঠে ফিরে যায়। পতিত জায়গা বা আবর্জনা পূর্ণস্থানে ইঁদুর নিরাপদে বংশ বিস্তার করতে পারে।

৩। লক্ষ্য ফসল (Target crop) : ফসলের প্রকার, বর্ধনস্তর, কর্তনস্তরের অবস্থা, শস্য, পানিয় ইত্যাদি বিষয় জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশে গম ও ধান, ভুট্টা (দানাদার শস্যে) ইঁদুরের আক্রমন মাঠে সবচেয়ে বেশি হয়। খাদ্যের চাহিদা পূরনের জন্য এখন বছরে তিন বার ধান চাষ করা হয়। এজন্য ইঁদুর সারা বছরই বংশ বিস্তারের সুযোগ পেয়ে থাকে।

কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ (Community Approach)

সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে ইঁদুর দমন অথবা মেরে থাকে। এতে সফলতার পরিমাণ অত্যন্ত কম হচ্ছে। কারণ ইঁদুর খাদ্য, পানীয় ও বাস স্থানের জন্য সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে তাদের অনুকূল পরিবেশ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। এজন্য মাঠের ফসলের বেশি এলাকা এবং পাড়া অথবা গ্রামের সবাই একত্রে ইঁদুর দমন করা প্রয়োজন। এত প্রতিবেশির মাঠ অথবা বাড়ীতে ইঁদুর আগমনের সম্ভাবনা কমে যায়। সফলভাবে ইঁদুর দমন করতে হলে কমিউনিটির সকলের অংশ গ্রহণ অপরিহার্য্য।

এইড-কুমিল্লার পরিচালিত কমিউনিটি গবেষনার ফলাফলে ইঁদুরের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কৃষকগণ কম রাখতে পেরেছেন। বর্তমানে পাঁচটি জেলার যথা- কুমিল্লা, নেত্রকোনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও সাতক্ষিরা জেলার ৮টি উপজেলার ১০০টি গ্রামে কমিউনিটিবেইজ পরিবেশ বান্ধব ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- একটি গ্রামের ২০০টি পরিবার নির্বাচন করে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- প্রত্যেক দলে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকবেন যাদের শতকরা ৭০ ভাগ মহিলা অংশগ্রহণ করবেন।
- প্রথমে ২৫ জনকে কিল ফাঁদ ও ডাইরী দেয়া হবে।
- ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ৭ দিন নিজেদের বাড়ি-ঘরের ইঁদুর নিজেরা মারবেন এবং কতটি ইঁদুর মারা পড়েছে তার হিসেব ডায়রীতে লিখে রাখবেন।
- ৭ দিন পর ঐ গ্রামের অন্য ২৫জন পরিবারকে উক্ত ফাঁদগুলো ৭ দিন ইঁদুর মারার জন্য দেয়া হবে।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে ২০০ জন পরিবারকে ফাঁদ দ্বারা ইঁদুর মারার পর আবার প্রথম দলের নিকট (২৫জন) ফাঁদ প্রদান করা হবে।
- ২০০ পরিবারের একবার ইঁদুর মারার পর আবার প্রথম দলের নিকট (২৫ জন) ফাঁদ প্রদান করা হবে।
- এভাবে সারা বছর ধরে ২০০ পরিবার পর্যায়ক্রমে ফাঁদ দ্বারা ইঁদুর ধরা বা মারা অনুশীলন করানো হবে। এর মাধ্যমে কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ এর সুফল কৃষকগণ বুঝতে পারবেন।

ফাঁদ দ্বারা ঝুম ফসলের ইঁদুর ব্যবস্থাপনা

অধিকাংশ ইঁদুরেরর প্রজাতি সমূহ আচরনে নিশাচর এবং এরা মানুষসহ সকল পরভোজী সম্পর্কে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকে। এজন্য এদের ফাঁদে আটকাতে হলে সঠিক স্থানে সঠিক ফাঁদ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ দ্বারা ইঁদুর ধরে থাকে। নানা দলের মানুষ নির্দিষ্ট ফাঁদ এবং জাল তৈরী করছে যার অতি নিকটে/সংস্পর্শে এলে হয় ইঁদুর মরবে অথবা আটকিয়ে যাবে। ঝুম চাষ এলাকায় ফাঁদ নিচু বাঁশের বেড়ার (fence) সমন্বয়ে বসানো হয় যাহাতে বেড়া ইঁদুরকে ফাঁদের অভিমুখে যেতে দিক নির্দেশ করে।

রুমা উপজেলায় অনেক ঝুম চাষী ফসলের চারিদিকে অথবা যেদিক হতে ইঁদুরের আক্রমন বেশি হতে পারে সেদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে থাকে। ১০ হাত পরপর তাদের উদ্ভাবিত ফাঁদ ব্যবহার করে থাকে। এ ফাঁদ এক বছর পর্যন্ত ভাল থাকে। পরবর্তীতে মেরামতের প্রয়োজন। ২-৩ একরের ঝুম ফসলের জন্য এ ফাঁদ তৈরী করতে ৮-১০ হাজার টাকার খরচ হয়। এ ফাঁদ খুবই কার্যকর।
ঝুম চাষীগণ ৫০ বছর ধরে এ ফাঁদ ব্যবহার করে আসছে। বাঁশের বেড়ার অসুবিধা হলো ইঁদুর বাঁশের বেড়া বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে।এক বছরের বেশি টিকসই হয় না।

বাঁশের তৈরী বেড়া ফাঁদ

লাউসের উচ্চভূমিতে ঐতিহ্যগত ডেড-ফল ফাঁদ নিচু বেড়ার নিকট স্থাপন করে ইঁদুর ধরে থাকে (চিত্র)

পলিথিন দ্বারা বেড়া প্রদান ও ফাঁদ ব্যবহার অনেক ভাল ফল পাওয়া গেছে। যখন ইঁদুর বাধার সম্মুখীন হয় তখন লাফিয়ে অথবা আরোহন করার পরিবর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত পথ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত দৌড়াতে থাকে। সাধারণত ফাঁদ বেড়ার গর্তের বিপরীতে স্থানে নিয়মিত পাতা হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন মাঠে রৈখিক ফাঁদ প্রতিবন্ধক পদ্ধতি (LTBS– Liner Trap Barrier System) ব্যবহার ভাল ফল পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে ঝুম ফসলে বাঁশের পরিবর্তে পলিথিনের বেড়া দিয়ে তাঁদের উদ্ভাবিত ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বাঁশের চেয়ে খরচ কম হবে। বেশি দিন ব্যবহার করতে পারবে।

পলিথিন দ্বারা তৈরী বেড়া- ফাঁদ

কিল ফাঁদ (Killed ফাঁদ) ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ফাঁদ সব আকারের (ছোট বড়) ইঁদুর ধরা যায়। এ ফাঁদ ঘরেও মাঠে ব্যবহার করা যায়।

কিল/মরণ ফাঁদ

ইঁদুরদের খাদ্য, পানি ও নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ কমানোর মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে। এ ধরনের পরিবেশগত হস্তক্ষেপ বিশেষ করে পরিবারের পর্যায়ের শস্য দানার গুদাম এবং পল্লী গ্রাম সম্পর্কীয় যেখানে খাদ্য গুদামটি প্রতিরোধ করে এবং পরিবারের আশে পাশে ইঁদুরের নিরাপদ আশ্রয় স্থান কম রাখার মাধ্যমে সংরক্ষণকৃত খাদ্য শস্যের ইঁদুরের ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ঝুম চাষ এলাকায় চাষীদের ঘরে খাদ্য শস্য বাঁশের ডোলে রাখা হয়। ডোলের উপরে কোন ঢাকনা বা আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয় না। সংরক্ষণকৃত শস্যে ইঁদুরের বিষ্ঠা ও মূত্রের ক্ষতি দেখতে পেয়েছি।

কমিউনিটির অংশ গ্রহণমূলক গবেষণার ইঁদুরের প্রবেশে কমানোর কৌশলগত দিক (Strategies) ও পদ্ধতি (Methods) ব্যবহার করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে শস্য গুদামটি ন্যূনতম ব্যয়ে এবং পরিশ্রমে ইঁদুর ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

বাঁশের তৈরী শস্য দানা গুদামের প্লাট ফর্মের (মঞ্চের) উপস্থাপন করা হয়, যেখানকার খুঁটি টিনের পাত দিয়ে মুড়িয়ে প্রতিরোধক করা হয় যাতে ইঁদুর মাটি হতে গুদামটিতে আরোহন করতে পারে না। অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শস্যদানা গুদামটির উপরের অংশ অবশ্যই সঠিক টেকসই আবরণ দ্বারা বন্ধ বা ঢেকে রাখতে হবে যাতে ঘরের দেওয়াল অথবা ফাঁদ হতে ইঁদুর লাফ অথবা আরোহন করতে না পারে এমন প্রতিরোধক সম্পন্ন করতে হবে। টিনের পাত অথবা অন্য ধাতব দ্বারা বিদ্যমান গুদাম কাঠামোটির উপরি অংশ ভালভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে। পাশে ঝুলে থাকা প্রান্ত ইঁদুরকে আরোহন বা উঠতে বিরত রাখবে।

চিত্র : উন্নত ধানের গোলা

ইঁদুরের মাংশ ভক্ষণ

ইঁদুরের মাংস অনেক মানুষের নিকট অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য। এ দ্বারা তাদের প্রোটিনের অভাব পূরন হয়। দিনাজপুরে ইঁদুরকে মাটিয়া কই হিসেবে অবিহিত করা হয়। এ অঞ্চলে ইঁদুরের মাংস মুরগীর মাংশের মত রান্না করে খেয়ে থাকে। তাদের ভাষায় ইঁদুরের মাংস মুরগীর মাংসের চেয়ে বেশি সুস্বাধু।

রুমা উপজেলার ইঁদুরের মাংস খেয়ে থাকেন : প্রথমত- তাজা মাংস দ্বিতীয়ত- শুটকী দিয়ে।

তাজা মাংস তৈরী ঃ প্রথমে ইঁদুরের পেটের নাড়িভুড়ি ফেলে দিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়। এরপর চিকন সলা পায়ু পথে প্রবেশ করে আগুনে ভালভাবে ঝলসিয়ে লোম পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করে থাকেন। এরপর লবন, মরিচ ও অন্যান্য মসলা মেখে তেলে ভেজে রোস্ট তৈরী করে খেয়ে থাকেন। অনেকে চামড়া দিয়ে মাংস সবজী রান্না করে খেয়ে থাকেন। যে অঞ্চলের মানুষ ইঁদুরের মাংস খেয়ে থাকেন তাদের বেশি করে ইঁদুর ধরার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

চিত্র : মাংস তৈরীর ছবি

মাংস শুকানো পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে প্রথমে পেটের নাড়িভূড়ি ফেলে দিয়ে থাকে। এরপর চামড়া ছিলে ফেলে দিয়ে থাকে। পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ার পর মাংস পাতলা স্লাইস বা টুকরা করে উনুনের আগুনে শুকানো হয়। অর্থাৎ মাংসের পানি সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়। এ শুকনা মাংস বর্ষার সময় অথবা Off season খেয়ে থাকে। সাধারণত যখন ইঁদুর বেশি ধরা পড়ে তখন শুটকী দিয়ে থকে।

সাবধানতা ঃ ইঁদুর মানুষের ও প্রাণীর ক্ষতিকারক জীবানু বহন করে থাকে যা মাংস তৈরীর সময় মানুষের মধ্যে প্রবেশে করার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ইঁদুরের মাংস তৈরী করার পর সাবান দিয়ে হাত ভালভাবে অবশ্যই পরিস্কার করতে হবে। তা হলে ইঁদুর বাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

মাঠ হতে ইঁদুর সংগ্রহ করার পরও হাত, পা, মুখমন্ডল ভালভাবে সাবান দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

যেসব এলাকায় বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর মেরে থাকেন সেসব এলাকায় ইঁদুরের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ বিষ টোপ দ্বারা মৃত ইঁদুর কোন অবস্থাতেই খাওয়া যাবে না।

পরভোজী প্রাণী দ্বারা ইঁদুর দমন

বিড়াল, বনবিড়াল, পেঁচা, গুইশাপ, অবিষধর সাপ, বেজি ইত্যাদি প্রাণীর প্রধান খাদ্য হচ্ছে ইঁদুর।বনবিড়াল প্রতিরাতে ২-৫টি ইঁদুর মারতে পারে। শিয়াল প্রতিরাত্রে ৫-১০টি ইঁদুর মারতে পারে। যদিও শিয়াল আখ ও ফসলের ক্ষতি করে থাকে। গুইসাপ প্রতিদিন ২-৫টি ইঁদুর মেরে থাকে। পেঁচা প্রতি রাত্রে কমপক্ষে ১-২টি ইঁদুর মেরে থাকে। মালয়েশিয়া কৃত্রিম উপায়ে পেঁচা উৎপাদন করে ফসলের মাঠে পেঁচার ঘর বানিয়ে একজোড়া পেঁচা (স্ত্রী ও পুরুষ) ছেড়ে দিয়ে ইঁদুরের সমস্যা ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পেরেছে। আমাদের দেশে এ সকল প্রাণীর বংশ বিস্তারের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। উপকারী প্রাণীদের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলে ইঁদুর জাতীয় ক্ষতিকারক প্রাণীর বংশ বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। পরভোজী প্রাণীদের রক্ষা ও বংশ বিস্তারের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা একান্ত প্রয়োজন।

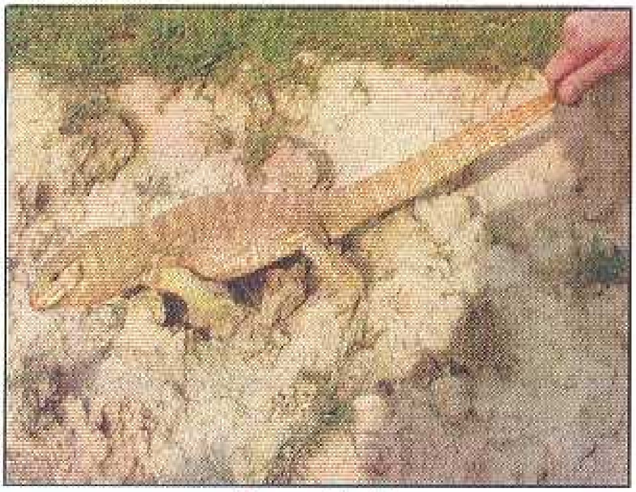

চিত্র : গুইসাপ

চিত্র : সাপ

চিত্র : পেঁচা

চিত্র : বেজি

বাঁশের ফুলের সাথে ইঁদুরের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক

ইঁদুর বন্যা কিঃ

কোন স্থানে হঠাৎ করে ইঁদুরের সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। অর্থাৎ বন্যার পানির ন্যায় ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। ইঁদুরের সংখ্যা এত বেশি হয়ে যায়, যা দমন করা কঠিন হয়।

4 nights' catch, 1917
Lascelles, Victoria, Australia

কারণ সমূহ

> স্থানীয় ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণী বাঁশের ফল ধরা স্থানে জড় হয়।
> আশে পাশের অন্যান্য বন্য প্রাণীরাও জড় হয়।
> ইঁদুর বেশি খাদ্য পায় বলে প্রজনন ক্ষ মতা বাড়িয়ে দেয়।
> সকল প্রকার ইঁদুরের প্রজাতির বংশ বিস্তার বেড়ে যায়।

বন্যা এলাকায় ইঁদুরের সংখ্যা প্রতি হেক্টরে

দেশের নাম	ইঁদুরের সংখ্যা
সেন্টমার্টিন, চিলি	১১৬ টি
আর্জেনটিনা	১৪৮ টি
রোম	২৫০ টি
বাংলাদেশ (খাগড়াছড়ি)	১৯৪৪ টি

চিত্র : খাগরাছড়ি জেলায় ধৃত ইঁদুর

ইঁদুরের বন্যার প্রভাব

- মাঠের জুম ফসল (ধান, সরিষা, আনারস, পেঁপে, আলু, মরিচ সকল প্রকার) ব্যাপক ক্ষতি হয়।
- ঘর বাড়ির খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়।
- খাদ্য সংকট দেখা দেয়।
- প্লেগ সহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।
- বাঁশের অভাব দেখা দেয়।
- আর্থ সামাজিক ওজীবন যাত্রার মান নিম্নমূখী হয়।

চিত্র : খাগরাছড়ি জেলায় ধৃত ইঁদুর

ইঁদুর বন্যার নামকরণ

ইঁদুর বন্যা এক এক দেশে এক এক নামে অভিহিত করা হয়েছে।
নর্থ আমেরিকাতে র‍্যাটাডাস প্রজাতির নাম অনুসারে র‍্যাটাডাস করা হয়েছে।
ব্রাজিলে চিলি ইঁদুরের প্রাদুর্ভাব অনুসারে করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতে বন্যার পানির সাথে তুলনা করে ইঁদুর বন্যা নামকরণ করা হয়েছে।

বাঁশের ফুলের সাথে ইঁদুরের সম্পর্ক

* বাঁশ সত্যিকারে ঘাস পরিবারের অন্তর্ভূক্ত (True grass family)
* প্রজাতি ভেদে বাঁশে ফুল ধরে ৩-১২০ বছরের মধ্যে
* সব বাঁশে ফুল আসলে ইঁদুর উপদ্রব হয় না
* ৪০-৫০ বছর পর পর কিছু বাঁশের প্রজাতিতে ফুল আসলে ঐ এরিয়ায় ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে যায় এ ধারনা ঐ এলাকাবাসীদের।
* বাঁশের ফুল হল ইঁদুর বন্যা হওয়ার একটি ইন্ডিকেটর।
* বাঁশে ফুল আসার ৮-৯ মাস পর ফল ধরে।
* বাঁশের ফল ধান ও গমের চেয়ে কিছুটা পুষ্টি যুক্ত।
* বন্যা ও পানি বেড়ে গেলে ইঁদুর বন্যা হয় বলে ধারণা।
* ফল আসলে এ জাতের বাঁশ মরে যায় কিন্তু সব প্রজাতির বাঁশ মরে না।

চিত্র : বাঁশের ফল

* বাঁশের ফল বেশি খেলে ডায়রিয়া হয়। যদিও বাঁশের বীজে টক্সি কম্পাউন্ড (Toxic Compounds) অন্যান্য বৃক্ষের বীজের ন্যায় বিদ্যমান নেই।
* ১৮৯৯-১৯০০ সনে ভারতের মধ্য প্রদেশে অতিরিক্ত খড়ার সময় ৩৫০০০ মানুষ বাঁশের ফল খেয়ে বেঁচেছিল।
* বাঁশের পর্যাপ্ত বীজ (Bamboo Seed) ইঁদুর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বন্য প্রাণীদের যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গন গুলো হচ্ছে-

Melocanna;
Dendrocalamus;
Bambusa;
Schizostachyum
Sinarundinatia

বাংলাদেশে বাঁশের যে দুইটি প্রজাতিতে ফুল ধরলে ইঁদুর বন্যা হয়
তা হচ্ছে- M. baccifera and D. hamiltonii.
মোট বাঁশ এলাকার ৮০% এ দু'টি প্রজাতির বাঁশ বিদ্যমান রয়েছে।

ভারতের মিজোরিয়াম ও বার্মা এবং বাংলাদেশে ইঁদুর বন্যার সম্পর্ক

০ বঙ্গপোসাগর অঞ্চলে ২০ ধরনের বাঁশের প্রজাতিতে ফুল আসে।
০ ভারতের মিজোরামে ৫টি বাঁশের প্রজাতিতে ফুল আসলে ইঁদুর বন্যা শুরু হয়। ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত মিজোরামে ইঁদুর বন্যা হয়েছে।
০ বাংলাদেশে ২০০৮ সালে পাইয়া ও মাটিয়াংপা বাঁশে ফুল আসার সময় ইঁদুর বন্যা হয়েছে।
০ মিজোরামে বাঁশের ফুল ধরা শেষ বাংলাদেশে বাঁশে ফুল আসা আরম্ভ করে ও ইঁদুর বন্যা শুরু হয় ২০০৮।
০ এ জাতের বাঁশের ফুল ধরা ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত চলবে।
০ এলাকার জনগণের ধারণা এ সময় ইঁদুরের আক্রমন আরো বেড়ে যাবে। এ বিষয়ে গবেষনা হওয়া প্রয়োজন।
০ ভারতের মিজুরাম ও বার্মার ইঁদুর বাংলাদেশে আগমন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইঁদুর বন্যা কেন এত ভয়ের কারণ-

* ১৯৯৪ সনে ভারতের সুরাটে প্লেগ রোগের আক্রমনের কারণে জীবনহানী ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমেছিল।
* মিজোরাম ও বার্মায় প্লেগ রোগের উপদ্রব রয়েছে। বাংলাদেশেও এ রোগের বিস্তার যে কোন সময় ঘটতে পারে। প্লেগ হচ্ছে একটি ছোয়াছে রোগ।

প্লেগঃ

ইঁদুর প্লেগ রোগের জীবানু বহন করে। প্লেগ হলো ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। প্লেগ রোগাক্রান্ত ইঁদুরকে ফ্লি কামড় দিলে ফ্লি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। অতঃপর আক্রান্ত ফ্লি মানুষকে কামড় দিলে মানুষও প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। এইভাবে আক্রান্ত মানুষ হইতে ফ্লি এবং ফ্লি হইতে মানুষে প্লেগ রোগ বিস্তার লাভ করে। মানুষসহ বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি ও প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হয়।

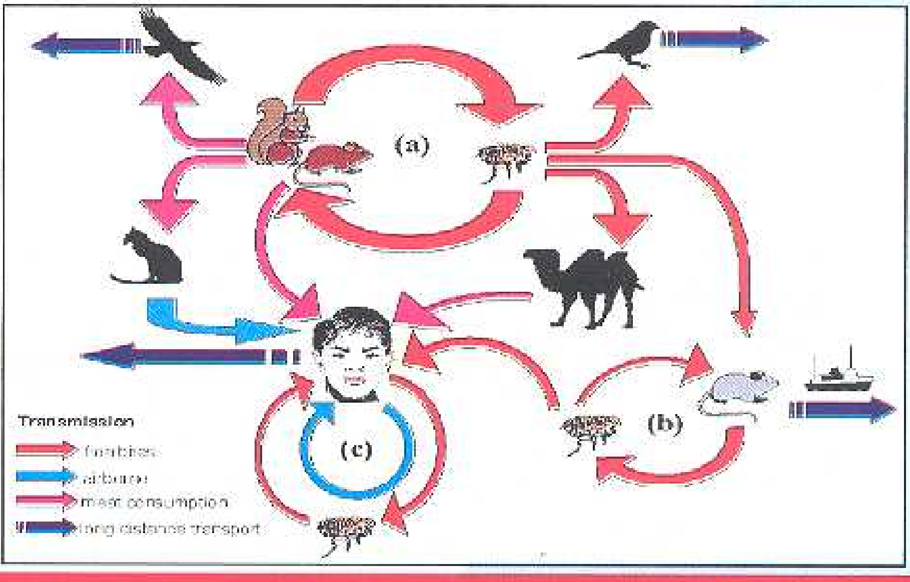

ইঁদুরের প্রজাতি

গেছো ইঁদুর ঝুম ফসল এলাকায় এক নম্বর ক্ষতিকর প্রজাতি। ভারতের মিজুরাম অঞ্চলে গেছো ইঁদুর *(Rattus rattus)* বেশি পাওয়া গেছে। পাবর্ত্য অঞ্চলে গেছো ইঁদুর বেশি পাওয়া গেছো। সাদা লেজ বিশিষ্ট একটি ইঁদুর পাওয়া গেছে যা শনাক্ত করনের কাজ চলছে।

ইঁদুর বন্যা সমস্যা সমাধানে করনীয়

০ ইঁদুর বন্যা ৪০-৫০ বছর পর পর হয়। এ জন্য ইঁদুরের পপুলেশনের হ্রাস-বৃদ্ধির জরিপ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

০ ইঁদুরের সংখ্যা জুম ফসলে ও ঘর বাড়িতে বৃদ্ধি পেলে দমন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

০ এ সমস্যা উত্তরনের জন্য কমিউনিটির জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে একই সাথে বেশি এলাকার ইঁদুর মারতে হবে।

০ যারা ইঁদুরের মাংস খেয়ে থাকেন তাদের বেশি করে ইঁদুর শিকারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

০ ঝুম শস্য ক্ষেতের চারপাশে বেশি প্রশস্ত জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে। এতে জংগল হতে কম ইঁদুর জুম ফসলে আগমন ঘটবে। ঝুম ক্ষেতের বাহিরের গাছপালার ডাল কেটে দিতে হবে। এতে ইঁদুর ডালাপালা বেয়ে ঝুম ফসলে কম আসবে।

০ ঝুম শস্য ক্ষেতের চারপাশে ইঁদুর বন্যা প্রতিরোধের জন্য কমিউনিটি বেড়া-ফাঁদ তৈরি করতে হবে (পলিথিন বা বাঁশ দ্বারা বেড়া তৈরি করা)। বেড়ার ১০ মিটার অন্তর অন্তর বাঁশের তৈরি ফাঁদ অথবা কিল-ট্রাপ ব্যবহার করতে হবে।

০ ঘরের চারপাশের ডালপালা, বাঁশ কেটে ফেলতে হবে। এতে ঘরে ইঁদুরের প্রবেশ কম হবে।

০ ঘরের সংরক্ষণকৃত খাদ্যশস্যের (ডোল) উপরিভাগ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

০ যে সমস্ত এলাকার জনগন ইঁদুরের মাংস খেয়ে থাকেন সে সমস্ত এলাকায় ইঁদুরনাশক (বিষটোপ) ব্যবহার করা বা সুপারিশ করা যাবেনা।

০ ঝুম চাষীদের ইঁদুর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

০ ইঁদুর ধরার বা মারার ব্যবস্থা সারা বছর চালু রাখতে হবে।

০ যারা ইঁদুরের মাংস খেয়ে থাকেন তাদেরকে মাংস তৈরির পর হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে।

চিত্র : বাঁশের ফুল

চিত্র : বাঁশের ফল

চিত্র : বাঁশের ফুল

বাংলাদেশে ইঁদুর ব্যবস্থাপনার সমস্যা

১। দলগতভাবে ইঁদুর মারতে চায় না অথবা অভ্যস্থ নহে।

২। ইঁদুরের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি জনসাধারণ গুরুত্ব কম দেয়। সাধারণত কৃষকগণ পোকা দমনের জন্য বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

৩। ইঁদুর দ্বারা ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না।

৪। ইঁদুর বাহিত রোগ সম্পর্কে মানুষের ধারণা কম। এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই কারণ আমাদের দেশে কোন গবেষণা হয় না।

৫। ইঁদুর রাস্তাঘাট, রেলরোড ও বাঁধের ক্ষতি করে কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্থা ইঁদুর দমনের কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেয় না। এজন্য এসব স্থানে ইঁদুর নিরাপদে বংশ বিস্তার ও বসবাস করতে পারে।

৬। ইঁদুরের বিষটোপ ও ফাঁদ লাজুকতা বিদ্যমান।

৭। একটি দমন ব্যবস্থা দ্বারা সফলভাবে ইঁদুর দমন করা সম্ভব নয়। মানুষ মরা ইঁদুর দেখতে চায়। এজন্য বিষটোপ বেশি ব্যবহার করে। তাঁরা অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে চায় না। অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব ইঁদুর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব।

৮। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইঁদুরভোজী প্রাণী যেমন সাপ, বন্য বিড়ালসহ অন্যান্য বন্য প্রাণীদের নিধন করার জন্য উক্ত অঞ্চলে ইঁদুর বন্যার সৃষ্টি হয়।

আরও তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করুন

এইড-কুমিল্লা

গ্রাম ঃ রঘুপুর, ডাকঘরঃ রাজাপাড়া, ইউনিয়ন ঃ জগন্নাথপুর, উপজেলা ঃ কুমিল্লা সদর, জেলা ঃ কুমিল্লা।
টেলিফোন ঃ ০৮১-৬২৪৪৪, ০৮১-৭২০০৩ ফ্যাক্স ঃ ০৮১-৬২৪৪৪, ই-মেইল ঃ aidazad@btcl.net.bd
web page : www.aidcomilla.org

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইনঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম ও মোঃ মনিরুল ইসলাম